ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

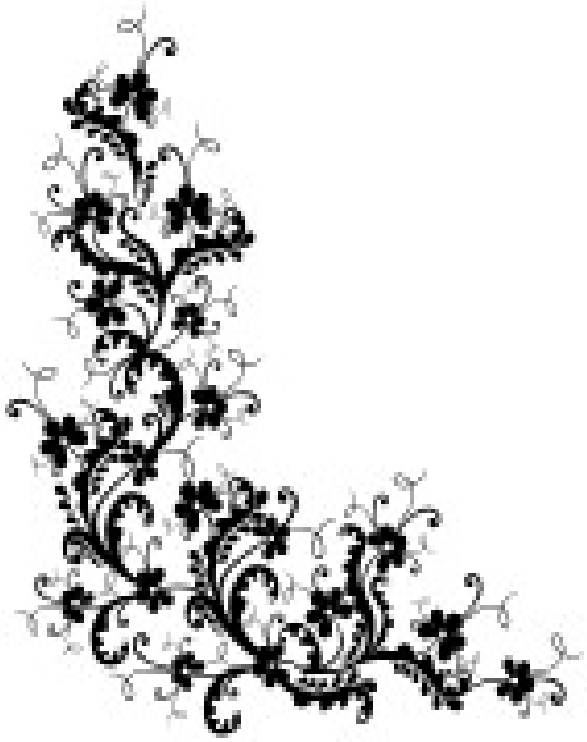

মূল : ডা. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর
সার-সংকলক : প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

মূল : ডা. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর
সার-সংকলক : প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী
ফোন : ০১৫৫২-৩১৫০৩৮, mail : hishab3@gmail.com

প্রকাশকাল : ইন্টারনেট সংস্করণ - এপ্রিল ২০১৫

এই সংকলক প্রণীত অন্যান্য বই

১। জামা'তে নামায পড়া : গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং নামায পড়ার খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুন
২। চান্দ্রমাসের ইসলামী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব বনাম 'চান্দ্রমাস' নামক বই এর বিভ্রান্তি
৩। কুরআনে কিয়ামাত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র
৪। নামাযে খুশু' (মনোযোগ ও একাগ্রতা) অর্জনের উপায়সমূহ (অনুবাদ পুস্তিকা)
৫। দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ : ঈমানদারের জন্য অভিশাপ না আশীর্বাদ (অনুবাদ পুস্তিকা)

প্রাপ্তিস্থান:

- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা), ফোন : ৯৬৭০৬৮৬।
- ২/৬ ব্লক-জি, লালমাটিয়া, ঢাকা, ফোন : ০১৫৫২-৩১৫০৩৮।
- আই.সি.ডি., বাড়ী - ৫, (দুতলা), রোড- ১১, শেখেরটেক, ঢাকা।

ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সহচরবৃন্দের প্রতি।

এই বইটি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্বনামধন্য লেখক ডা. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর (পি.এইচ.ডি. রিয়াদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া) কর্তৃক প্রণীত "কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী আকীদা" নামক বিখ্যাত পুস্তকটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি যে, ঈমান বা আকীদা বিষয়ে বই লিখার মত যোগ্যতা আমার নেই। এর মূল কারণ, ছোট বেলা (গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক) ঈমান সম্পর্কে যা শিখেছিলাম তা ছিল ঈমানের মূল ছয়টি স্তম্ভের নাম, তার পর গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা-প্রশাখার ও ঈমানহীনতার (কুফ্‌র ও শির্‌ক্) সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশদ প্রামাণ্য বিবরণসহ বাংলায় লিখা কোন বই নজরেও আসেনি। বরং দেশে বিদ'আত ও ভ্রান্ত আকীদার বিষয় সম্বলিত বহু পুস্তক ধর্মীয় পুস্তকের মর্যাদায় মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন বা বিশেষ কিছু তথাকথিত পালনীয় দিবসের পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত ছিল এবং এখনও আছে। প্রথম জীবনে আরো অনেকের মত ঐ বইগুলিই ছিল আমাদের কাছে পঠিতব্য "ধর্মীয় বই"। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে ইসলামের উপর সুশিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ আলিমের আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার ফল হিসাবে তাঁদের প্রণীত বা অনুদিত বেশ কিছু দ্বীনি বই আমরা পড়ার সুযোগ ও দ্বীন সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছি। দুই ডজনের বেশী অতি মূল্যবান ইসলামী বই এর প্রণেতা ডা. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এ সকল আলিমদের মধ্যে অন্যতম।

আমাদের দেশের মুসলিমগণের এক বৃহৎ অংশের ধর্ম পালনের প্রচলিত ধারা হচ্ছে "মকসুদুল মু'মিনীন" বা "বারো চান্দের ফযীলত" জাতীয় বইয়ের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সারা বৎসর ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদাতের আদিষ্ট কর্তব্য যথাযথ পালন না করে কয়েকটি বিশেষ দিন বা রাতের বানোয়াট কিছু ইবাদাতের মাধ্যমে অতি সহজে বেহেশ্‌ত লাভ করার সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান করা। এর একটি মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈমান বা আকীদার শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদার অনুপ্রবেশ ও ধর্মীয় বিশুদ্ধ বই পড়ার আগ্রহের অভাব। তাই বর্তমানে আকীদা বিষয়ে বেশ কিছু পুস্তক বাজারে বিদ্যমান থাকলেও পাঠকগণের বৃহত্তর অংশ মাযহাব বা পীরের অনুসরণ ইত্যাদির দোহাই দিয়ে এ সকল বই পড়তে চান না। যাদের ধর্মীয় বই পড়ার অভ্যাস

আছে তাদেরও অনেকে আকীদার উপর লিখা অতি উচ্চমাণের বই হওয়া সত্ত্বেও ড. খ. আ. জাহাঙ্গীরের উপরোক্ত বইটির বৃহৎ কলেবর (প্রায় সাড়ে ছয়শত পৃষ্ঠা) দেখে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। বইটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রণয়ন করতে পারলে আকীদা বিষয়ে আমার নিজের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে এবং এ সকল প্রান্তিক পাঠকের আগ্রহ জন্মাতেও সহায়ক হবে ভেবে লেখকের অনুমতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত সংকলনটির কাজে হাত দিই। এ কাজের প্রক্রিয়ায় আকীদার মৌলিক কোন বিষয় বিসর্জন দেয়া হয় নি, কেবল সাধারণ পাঠকের কথা বিবেচনা করে কিছু বিষয়ের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ের পাঠ্যগুলি হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, একটি বিষয়ের উপর প্রমাণ ও উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত কুরআনের একাধিক আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণগুলি রেখে বাকীগুলির নির্দেশ নম্বর উদ্ধৃত করা হয়েছে। কলেবরের হিসাবে সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণটি মূল বই-এর প্রায় ৪০%।

মূল বইতে 'তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত' অনুচ্ছেদটি তুলনামূলকভাবে বেশী সংক্ষিপ্ত হওয়ায় লেখকের পরামর্শে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত (জানুয়ারী ২০১৪) বই 'আল-ফিকহুল আকবার : বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা' থেকে মূল্যবান অনেক তথ্য এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'আল-ফিকহুল আকবার' পুস্তকটি ইমাম আবু হানীফা (র.) রচিত আকীদা বিষয়ক অতি মূল্যবান ও অনন্য এক পুস্তক।

পরিশেষে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস ভিত্তিক দ্বীনী শিক্ষামূলক পুস্তক প্রণয়নে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করুন, আমাদের সকলকে আল্লাহ সঠিক ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার শক্তি দিন এবং আমাদের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা করুন, এই দু'আ করি। আমীন।

প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক চৌধুরী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩
প্রথম অধ্যায় : আকীদার পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব	১২
১.১. পরিচিতি	১২
১.২. ইসলামী আকীদার উৎস	১৪
১.২.১. ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী	১৪
১.২.২. ওহীর প্রকারভেদ	১৬
১.২.৩. আকীদার উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি বনাম বিশ্বাসের বিচ্যুতি	১৭
১.৩. ইসলামী আকীদার গুরুত্ব	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : তাওহীদের ঈমান	২০
২.১. আরকানুল ঈমান	২০
২.২. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান	২০
২.২.১. তাওহীদের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর) অর্থ ও সংজ্ঞা	২০
২.৩. তাওহীদের প্রকারভেদ	২১
২.৩.১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব (তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ)	২১
২.৩.২. ইবাদাতের একত্ব (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ)	২২
২.৩.৩. নাম ও গুণাবলীর একত্ব (তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত)	২৪
তৃতীয় অধ্যায় : রিসালাতের ঈমান	৩৩
৩.১. রাসূলগণের প্রতি ঈমানের সামগ্রিক দিক ও তাঁদের বৈশিষ্ট্য	৩৩
৩.১.১. নবী ও রাসূল	৩৩
৩.১.২. নবী-রাসূলগণের সংখ্যা	৩৪
৩.১.৩. নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন	৩৪
৩.১.৪. সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ছিল এক	৩৪
৩.১.৫. নবী-রাসূলগণের মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন (আয়াত)	৩৫
৩.১.৬. বিশ্বাসের সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য	৩৫
৩.২. মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতে বিশ্বাস করার অর্থ	৩৫
তাঁর নুবুওতে বিশ্বাসের দিক সমূহ	
৩.২.১. নুবুওতে বিশ্বাস	৩৫

৩.২.২. তাঁর নুবুওতের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস ৩৬
৩.২.৩. তাঁর দ্বারা খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তিতে বিশ্বাস ৩৬
৩.২.৪. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) দায়িত্ব পলনের পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস ৩৭
৩.২.৫. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) শিক্ষার নির্ভুলতা ৩৭
৩.২.৬. রাসূল (সা.) এর আনুগত্য (ইতা'আত) ৩৮
৩.২.৭. তাঁর অনুকরণ ('ইত্তিবা') ৩৯
৩.২.৮. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) অনুকরণের ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী ৩৯
৩.২.৯. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) ভালবাসা ৪২
৩.২.১০. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলুল বাইত ও সাহাবীগণ ৪২
৩.২.১১. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা ও সম্মান ৪৩
৩.২.১২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদার বিষয়ে ওহীর অনুসরণ ৪৪
৩.২.১২.১. তাঁর মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক ৪৫
৩.২.১২.২. তাঁর ইল্‌ম বিষয়ক বিতর্ক ৪৬
৩.২.১২.৩. তাঁর হাযির-নাযির প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক ৪৭
৩.২.১২.৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে বিতর্ক ৪৮
৩.২.১২.৫. ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক ৫০

চতুর্থ অধ্যায় : মালাইকা, আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহ ও আখিরাতে বিশ্বাস ৫১
৪.১. মালাইকা বা ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান ৫১
৪.১.১. মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস ৫১
৪.১.২. মালাকগণের নামে বিশ্বাস ৫১
৪.১.৩. মালাকগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বাস ৫২
৪.১.৪. মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস ৫৩

৪.২. আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস ৫৪
৪.২.১. আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন ৫৪
৪.২.২. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও সেগুলির অবস্থা ৫৫
৪.২.৩. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সম্পর্কে মুসলিমগণের বিশ্বাস ৫৫
৪.২.৪. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫৬
৪.২.৪.১. কুরআনের অলৌকিকত্ব ৫৬
৪.২.৪.২. কুরআনের সংরক্ষণ ৫৭
৪.২.৪.৩. কুরআনের সর্বজনীনতা ৫৭

৪.৩. আখিরাতে বিশ্বাস ৫৮
৪.৩.১. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ৫৮

৪.৩.২. কবরের প্রশ্ন, কবরের শাস্তি ৫৯
৪.৩.৩. কিয়ামাতের আলামত বা পূর্বাভাস ৫৯
৪.৩.৪. ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর ৬০
৪.৩.৫. হিসাব ও প্রতিফল ৬০
৪.৩.৬. মীযান, সিরাত, হাউয ৬১
৪.৩.৭. শাফা'আত ৬১
৪.৩.৮. জান্নাত ও জাহান্নাম ৬৩
৪.৩.৯. পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন ৬৪

৪.৪. তাক্‌দীরে বিশ্বাস ৬৫
৪.৪.১. তাক্‌দীরে বিশ্বাসের অর্থ ৬৫
৪.৪.২. তাক্‌দীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি ৬৫
৪.৪.২.১. আল্লাহ্‌র অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস ৬৫
৪.৪.২.২. আল্লাহ্‌র লিখনে বিশ্বাস ৬৫
৪.৪.২.৩. আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিশ্বাস ৬৬
৪.৪.২.৪. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিশ্বাস ৬৬
৪.৪.২.৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস ৬৬
৪.৪.৩. তাক্‌দীরের বিশ্বাসের বিকৃতি ৬৭
৪.৪.৪. ইসলামী তাক্‌দীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা ৬৮

পঞ্চম অধ্যায় : অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি - ১: কুফ্‌র ও নিফাক ৭০
৫.১. কুফ্‌র ৭০
৫.১.১. অর্থ ও পরিচিতি ৭০
৫.১.২. কুফ্‌র এর প্রকার ৭০
৫.১.৩. কুফ্‌র আকবার এর প্রকারভেদ ৭১
৫.১.৩.১. আল্লাহ্‌র প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস ৭১
৫.১.৩.২. নাম ও গুণাবলীর একত্বে অবিশ্বাস ৭১
৫.১.৩.৩. ইবাদাতের একত্বে অবিশ্বাস ৭২
৫.১.৩.৪. রিসালাতে অবিশ্বাস ৭২
৫.১.৩.৫. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফ্‌র ৭৩
৫.১.৪. কুফ্‌র আকবার এর বিভিন্ন প্রকাশ ৭৪
৫.১.৪.১. ওহীকে মিথ্যা মনে করার কুফ্‌র (কুফ্‌র তাকযীব) ৭৪
৫.১.৪.২. অহঙ্কারের কুফ্‌র (কুফ্‌র ইস্তিকবার) ৭৪
৫.১.৪.৩. সন্দেহের অবিশ্বাস (কুফ্‌র শাক্ক) ৭৪
৫.১.৪.৪. অবজ্ঞার কুফ্‌র (কুফ্‌র ই'রায) ৭৫
৫.২. মুনাফিকীর কুফ্‌র (কুফ্‌র নিফাক) ৭৫

৫.২.১. বিশ্বাসের নিফাক (নিফাক আল-ই'তিকাদী) ৭৫
৫.২.২. কর্মের নিফাক (নিফাক আল-আমলী) ৭৬
৫.৩. কুফ্‌র আসগার বা ক্ষুদ্রতর অবিশ্বাস ৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি - ২: শির্‌ক্ ৭৮
৬.১. অর্থ ও পরিচিতি ৭৮
৬.১.১. শির্‌ক্ এর হাকীকত (প্রকৃতি) ৭৯
৬.১.২. তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ ৮১
৬.২. শির্‌ক্ আকবার ৮১
৬.২.১. প্রতিপালনের শির্‌ক্ (রুবুবিয়্যাতের শির্‌ক্) ৮১
৬.২.২. ইবাদাতের শির্‌ক্ ৮৩
৬.২.৩. নাম ও গুণাবলীর শির্‌ক্ ৯৩
৬.৩. শির্‌ক্ আসগার ৯৪
৬.৩.১. ইবাদাতে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ৯৪
৬.৩.২. ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শির্‌ক্ ৯৫
৬.৩.৩. আল্লাহ্‌র সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা ৯৬
৬.৩.৪. গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথ করা ৯৭
৬.৩.৫. অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা ৯৮
৬.৩.৬. ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাগ্য বক্তার কথায় বিশ্বাস করা ৯৯
৬.৩.৭. রশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করা ১০০
৬.৩.৮. কাউকে শাহানশাহ বলা ১০১
৬.৩.৯. কাউকে রাব্ব্ বা আব্‌দ বলা ১০১

সপ্তম অধ্যায় : শির্‌ক্ প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ্ ১০৩
৭.১. মুশরিকগণের পরিচিতি ও শির্‌কী কর্মসমূহ ১০৩
৭.১.১. জ্যোতিষী, প্রকৃতি পূজারী বা নক্ষত্র পূজারীগণ ১০৩
৭.১.২. মুশরিকগণ ১০৪
৭.১.৩. খৃষ্টানগণ ১০৪
৭.১.৪. কবর পূজারীগণ ১০৫
৭.২. শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা ১০৬
৭.২.১. বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভ্রান্তি ১০৬
৭.২.২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভ্রান্তি ১০৬
৭.২.৩. শয়তানের প্রতারণা ১০৭
৭.২.৪. বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ ১০৮
৭.২.৫. নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য ১০৮
৭.২.৬. ইবাদাতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ১০৯

৭.৩. শির্কের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা ১০৯
৭.৪. শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা ১১০
৭.৪.১. শির্ক্ ভয়ঙ্করতম পাপ ১১০
৭.৪.২. কুফ্র-শির্কের পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না ১১০
৭.৪.৩. শির্ক্-কুফ্র পূর্ববর্তী সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে দেয় ১১১
৭.৪.৪. শির্ক্-কুফ্র জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ ১১১
৭.৫. শিরকের উৎস সমুহ বন্ধ করা ১১১
৭.৫.১. ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা ১১২
৭.৫.২. মূর্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য ১১২

অষ্টম অধ্যায় : মুসলিম সমাজে শির্ক্ প্রবেশের প্রেক্ষাপট ও প্রচলিত শির্ক্-কুফ্র ১১৪
৮.১. হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী ১১৪
৮.২. ইহুদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ ১১৪
৮.৩. শিরকের বৈধতা দানের প্রবণতা ১১৫
৮.৪. মুসলিম সমাজে প্রচলিত শির্ক্-কুফ্র ১১৬
৮.৪.১. রুবুবিয়্যাতের শির্ক্ ১১৬
৮.৪.১.১ ক্ষমতা বিষয়ক শির্ক্ ১১৬
৮.৪.১.২. ওসীলা বিষয়ক শির্ক্ ১১৭
৮.৪.১.৩. আল্লাহ্র হুকুম প্রদানের ক্ষমতায় শির্ক্ ১২৪
৮.৪.২. ইবাদতের শির্ক্ ১২৬
৮.৪.২.১. গাইরুল্লাহ্কে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা ১২৬
৮.৪.২.২. গাইরুল্লাহর জন্য সাজদা ১২৭
৮.৪.২.৩. গাইরুল্লাহ্র জন্য মানত-নযর বা উৎসর্গ (কবর পূজা) ১২৮
৮.৪.২.৪. গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ ১২৯
৮.৪.২.৫. তাবার্‌রুক বিষয়ক শির্ক্ ১৩০
৮.৪.২.৬. প্রচলিত তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শির্ক্ ১৩২
৮.৫. শিরকের সেকাল ও একাল ১৩৪
৮.৬. কুফ্র বনাম তাকফীর ১৩৫
৮.৬. ১. ঈমানের দাবীদার কাউকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা ১৩৫
৮.৬.২. তাকফীরের মূল নীতি ১৩৬

নবম অধ্যায় : প্রকৃত সুন্নাতপন্থী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় ১৩৯
৯.১. আহল ১৩৯
৯.২. সুন্নাত ১৩৯

৯.৩. আল-জামা'আত ১৪০
৯.৩.১. অর্থ ও পরিচিতি ১৪০
৯.৩.২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য অর্থে আল জামা'আত ১৪১
৯.৩.৩. সাহাবীগণই মূল জামাত ১৪২
৯.৪. মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূল নীতি ১৪৩
৯.৪.১. ইফতিরাক বা বিভক্তির বিষয়াদি ১৪৩
৯.৪.২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল নীতি ১৪৪
৯.৪.২.১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূল নীতি ১৪৪
৯.৪.২.২. আল্লাহ্‌র নাম ও বিশেষণ (সিফাত) বিষয়ে মূল নীতি ১৪৫
৯.৪.২.৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূল নীতি ১৪৫
৯.৪.২.৪. পাপী মু'মিন বিষয়ক মূল নীতি ১৪৬
৯.৪.২.৫. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মূল নীতি ১৪৬
৯.৪.২.৬. ঐক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূল নীতি ১৪৬
৯.৪.৩. আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ ১৪৭

দশম অধ্যায় : বিদ'আত ও বিভক্তি ১৪৯
১০.১ বিদ'আতের পরিচয় ১৪৯
১০.১.১ অভিধানিক অর্থে বিদ'আত ১৪৯
১০.১.২ কুরআন কারীমে বিদ'আত ১৫০
১০.১.৩ হাদীসে নববীতে বিদ'আত ১৫১
১০.১.৪. সাহাবী-তাবি'য়ীগণের বক্তব্যে বিদ'আত ১৫২
১০.১.৫. তথাকথিত ভাল বিদ'আত ও মন্দ বিদ'আত তত্ত্ব ১৫৪
১০.১.৬. বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৫৪
১০.২. মুসলিম উম্মাহ্‌র আকীদাগত বিভাজন বা ইফতিরাক ১৫৫
১০.২.১. ইফতিরাক এর অর্থ ১৫৫
১০.২.২. কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইফতিরাক ১৫৬
১০.৩. ইফতিরাকের তথা বিভক্তির কারণ ১৫৮
১০.৩.১. ওহী ভুলে যাওয়া ১৫৮
১০.৩.২. মনগড়া (আরবীতে 'হাওয়া') মতামতের অনুসরণ ১৫৯
১০.৩.৩. হিংসা-বিদ্বেষ ১৫৯
১০.৩.৪. যা করতে নির্দেশ দেয়া হয় নি তা করা ১৬০
১০.৩.৫. অন্যান্য কারণ ১৬০
১০.৪ বিভক্তির স্বরূপ ও বিভ্রান্তির বিষয়াদি ১৬০
১০.৪.১. বিভক্তি বা ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট ১৬০
১০.৪.২. বিভ্রান্তির বিষয়াদি ১৬১
১০.৫. বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ (প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ) ১৬১

১০.৫.১. শীয়া ফিরকা ১৬১
১০.৫.১.১. উৎপত্তি ও মূল নীতি ১৬১
১০.৫.১.২. শীয়া সম্প্রদায়ের দল-উপদল ১৬৪
১০.৫.১.৩. দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়াগণ ১৬৪
১০.৫.১.৪. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ ১৬৬
১০.৫.১.৫. যাইদিয়্যাহ শীয়াগণ ১৬৮
১০.৫.২. খারিজী ফিরকা ১৬৯
১০.৫.২.১. উৎপত্তি ও ইতিহাস ১৬৯
১০.৫.২.২. আকীদা ও মূল নীতি ১৭১
১০.৫.২.৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ ১৭২
১০.৬. অন্যান্য ফিরকা ১৭৩
১০.৬.১. নাসিবা সম্প্রদায় ১৭৩
১০.৬.২. মুরজিয়্যাহ্ ১৭৩
১০.৬.৩. কাদারিয়্যাহ ১৭৪
১০.৬.৪. জাবারিয়্যাহ ১৭৪
১০.৬.৫. জাহমিয়্যাহ্ ১৭৪
১০.৬.৬. মু'তাযিলা ১৭৫
১০.৬.৭. মুশাব্বিহা ১৭৭

ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ

প্রথম অধ্যায়
আকীদার পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব

১.১। পরিচিতি

আরবী 'আক্‌দ' শব্দ থেকে গৃহীত আকীদা শব্দের অর্থ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা বা চুক্তি করা ইত্যাদি। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে আকীদা শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় ঈমান শব্দের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যদিও কুরআন বা হাদীসে আকীদা শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি, কেবল ঈমান শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে আকীদা হচ্ছে ধর্ম হিসাবে যে বিধান বা নির্দেশাবলী মানুষ সন্দেহমুক্তভাবে গ্রহণ করে (doctrine) তাই।

ইসলামী পরিভাষায় আকীদা হচ্ছে ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে চুক্তি বা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া তথা ঈমানের (ছয়টি মূল স্তম্ভের) ব্যাপারে এবং সকল ইমানী দাবীর কর্মপন্থায় অটল থাকা। সংক্ষেপে যা হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপর এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পরিপূর্ণ ও সন্দেহমুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস।

ঈমান আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় সম্পদ, এর উপর আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর করে। ঈমানের ক্ষতি হলে আমরা চূড়ান্ত ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হব। এই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি আমাদের চেষ্টা করা উচিত নয়? ঈমানের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করলেই তবে আমরা এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হব। ঈমান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতটুকু যথাযথ তা আমরা নিজেরাই যাচাই করতে পারি যদি নীচের প্রশ্নগুলির উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখি।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর প্রকৃত অর্থ কি? তাওহীদ কি? ইহুদী ও খৃষ্টানদের এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস, পৌত্তলিকদের এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস এবং মুসলিমদের এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কি? ঈমানের আরকান কি কি? কিসে ঈমান নষ্ট হয়? শির্‌ক্ কাকে বলে? কুফ্‌র কাকে বলে? ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য কি? ইত্যাদি।

ঈমান ও ইসলাম :

শাব্দিক অর্থে ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস, নিরাপত্তা, আস্থা ইত্যাদি, এবং ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ, আনুগত্য, শান্তি ইত্যাদি। তাই আভিধানিকভাবে ঈমান হচ্ছে বিশ্বাসের দিক

এবং ইসলাম হচ্ছে কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিকভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, " . . . ইসলাম ছাড়া কোন ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের কোন অস্তিত্ব নেই . . . .। ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরী'য়াকে একত্রে দ্বীন বলা হয়।" (শারহুল ফিকহুল আকবার)।

আমরা 'উম্মুল হাদীস' বা হাদীসে-জিব্রীল থেকে রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে ঈমান ও ইসলামের মৌলিক সংজ্ঞা জানতে পারি। হাদীসটি হচ্ছে :

হাদীস। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের মধ্যে এসে হাজির হলেন। তাঁর পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার চুল ছিল কালো কুচকুচে। তাঁর মধ্যে ভ্রমণের কোন চিহ্ন ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনেও না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী করীম (সা.)-এর দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তাঁর দুই হাত নবী (সা.) এর দুই ঊরুর উপর রাখলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে এবং বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র ঘর, কা'বা) পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করবে। (আগন্তুক) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁর কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন আর তিনিই তা সত্যায়িত করছেন। (আগন্তুক) তৎপর বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, ঈমান হলো, আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর বিশ্বাস করবে তাক্দীরের ভাল ও মন্দের প্রতি। তিনি (আগন্তুক) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার পর বললেন, আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, ইহ্সান হলো, আল্লাহ্র ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তা হলে (ভাববে) তিনি তো তোমাকে দেখছেন। অতঃপর (ঐ ব্যক্তি) বললেন, আমাকে কিয়ামাত (এর সময়) সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। ঐ ব্যক্তি বললেন, তা হলে আমাকে (কিয়ামাত) এর আলামত সম্পর্কে বলুন। রাসূল (সা.) বললেন, (তা হলো) দাসী আপন মুনিবকে প্রসব করবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার (অধিকারী হওয়ার) প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) বললেন, পরে লোকটি প্রস্থান করলেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তার পর রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, হে উমার! তুমি জান, এই

প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন, তিনি জিব্রাঈল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন। - মুসলিম-১। (মুসলিম-৫ এবং বুখারী-৪৮ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনার কিছু পার্থক্য নিয়ে অনুরূপ। তবে তাতে ইসলামের সংজ্ঞায় হজ্জের কথার উল্লেখ নেই)।

১.২। ইসলামী আকীদার উৎস :

ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি হলো জ্ঞান। কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তাকে জানতে হবে। বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাসই যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতে মানবীয় সফলতার চাবিকাঠি, সেহেতু ঈমান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করাই মানব জীবনের সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "অতএব তুমি জেনে রাখো যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই।" সূরা মুহাম্মাদ- ৪৭:৯।

বিশুদ্ধ ঈমান বিষয়ক সঠিক জ্ঞানই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁর আকীদা বিষয়ক বইটির নামকরণ করেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার' অর্থাৎ "সর্বোত্তম বা মহোত্তম ফিকাহ্"।

১.২.১। ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী :

মানবীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। লোকাচার, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, দর্শন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। এখন প্রশ্ন হলো, ঈমান, ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কি?

আমরা জানি যে, ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ্। সকল যুগের সকল দেশের সকল জাতি ও সমাজের প্রায় সকল মানুষই এই বিশ্বাস করেছেন বা করেন যে, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই নগন্য। এর প্রথম কারণ, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক অনুভুতি। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে এই অনুভুতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত এই বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও জানার নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সকল দেশের সকল মানুষ যখন স্রষ্টার বিশ্বাসে একমত, তা হলে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এত মতবিরোধ কেন?

এর কারণ স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে মতবিরোধ না থাকলেও মতবিরোধ রয়েছে স্রষ্টার প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক, স্রষ্টার প্রতি মানুষের দায়িত্ব, তাঁকে ডাকার বা তাঁর উপাসনা করার নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে। তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলেও কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর প্রতি মনের আকুতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাহায্য, করুণা

বা সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় মানুষ যুক্তি, বিবেক বা গবেষণার মাধ্যমে বুঝতে পারে না। মানুষ আরো যে সকল বিষয় সম্পর্কে যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক বা গবেষণা দ্বারা সঠিক ও চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় না সেগুলির মধ্যে আছে : কিভাবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনতে হবে, মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হবে ইত্যাদি। এ বিষয়গুলিই ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। আর এই বিষয়গুলি 'গাইব' বা অদৃশ্য জগতের বিষয় যা মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পাঠিয়ে মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে যখনই মানুষ ব্যক্তিগত ধারণা বা কল্পনার অনুসরণ করে তখনই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

অতএব ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে ওহী (Divine Revelation)। এজন্য কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণা বা নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা, মতামত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির উপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবককে অনুসরণ করো না।" সূরা আরাফ ৭:৩।

আর ওহীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যুগে যুগে মানুষ তাদের নবীদেরকে যে যুক্তি দেখাতো তা ছিল তাদের সামাজিক প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা নিজেদের পছন্দ। এ বিষয়ে কুরআনের অনেক আয়াতের মধ্যে একটি হচ্ছে,

> "এবং (হে রাসূল সা.) এভাবে আপনার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সে জনপদের সমৃদ্ধশালী (নেতৃস্থানীয়) লোকেরা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি'।" সূরা যুখরুফ ৪৩:২৩। আরো দ্রষ্টব্য- আয়াত ২৩:২৪, ২৮:৩৬, ২:১৭০, ১০:৬৬ ইত্যাদি।

এটা সহজেই অনুমেয় যে, অমুক কর্ম সবাই করছে বা যুগযুগ ধরে চালু আছে, অতএব এটা ঠিক - এ যুক্তি কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ তথ্যের বিশুদ্ধতা ও জ্ঞানের উৎসই কেবল কোন একটি বিষয়ের সঠিকতা প্রমাণ করতে পারে।

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সঠিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু গায়েবী জ্ঞান, যেমন একটি কাজ করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন কি না, তা মানুষের জ্ঞানের অতীত। তথাপি মূর্তিপুজারীরা সর্বদা এই মিথ্যা দাবী করে আসছে যে, মূর্তিপুজায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, কেননা মূর্তি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করায়, যদিও এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। মক্কার কাফিররা ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ্র মেয়ে বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহ্ কুরআনে তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন,

> "তোমাদের কাছে কি কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তাহলে তোমাদের ওহীলব্ধ কিতাবটা নিয়ে এসো; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" সূরা সাফ্ফাত, ৩৭:১৫৬-১৫৭।

১.২.২। ওহীর প্রকারভেদ :

রাসূলুল্লাহ্র (সা.) কাছে আল্লাহ্ তা'আলা দুভাবে ওহী পাঠাতেন। প্রথম প্রকার ওহী হচ্ছে কিতাব তথা কুরআন এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহী হচ্ছে হিকমাহ বা জ্ঞান, যা হাদীস হিসাবে পরিচিত।

কুরআন মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র সর্বশেষ বাণী। কুরআনের প্রতিটি অংশ শব্দ ও পাঠ্য হিসাবে (তিলাওয়াত হিসাবে) নাযিল হতো যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শব্দ ও অর্থসহ আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করতেন, সাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন।

দ্বিতীয় প্রকারের ওহী, যা জ্ঞান হিসাবে তাঁর উপর নাযিল হতো, তা তিনি নিজের ভাষায় সাহাবীদেরকে বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন এবং কখনো কখনো লিখাতেন। ইসলামী পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ্র (সা.) কথা, কর্ম ও অনুমোদন এসব কিছুকে হাদীস বলা হয়। মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগই হাদীস বা সুন্নাহ্। কুরআন ও হাদীসই আমাদের সকল জ্ঞানের ও কর্মের মূল উৎস। বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।" (হাকীম, আল-মুস্তাদরাক ১/১৭১, নং ৩১৮/৩১)।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনের আয়াত থেকে আক্ষরিক সরল ও স্বাভাবিক যে অর্থ বুঝা যায় তাই আকীদার মূল উৎস, কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় পরবর্তী যুগের আলিমগণ যে মতামত দিয়েছেন তা আকীদার উৎস নয়।

হাদীসের ক্ষেত্রেও হাদীস নামে সংকলিত সকল হাদীসই আকীদার উৎস হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কেবল সহীহ ও হাছান হিসাবে স্বীকৃত হাদীসসমূহ আকীদার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত। তবে মুতাওয়াতির বা অতি প্রসিদ্ধ হাদীসই কুরআনের পাশাপাশি আকীদার ভিত্তি হিসাবে গণ্য। এছাড়াও মুসলিম উম্মাহ্র

ইমামগণ অন্যান্য বিষয়ের মত আকীদার বিষয়েও সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যাকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক করেন। সাহাবীদের কেউ প্রশ্ন করেন, এক্ষেত্রে কোন্ দল সঠিক বলে গণ্য হবে? তিনি (সা.) বলেন,

> "আমি এবং আমার সাহাবীগণ বর্তমানে যে মত ও পথের উপর আছি সেই মত ও পথের উপর যারা থাকবে (তারাই সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত)।" (তিরমিয়ী, আস্‌সুনান ৫/২৬)।

১.২.৩। আকীদার উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি বনাম বিশ্বাসের বিচ্যুতি :

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঈমান, আকীদা বা ধর্মীয় বিষয়ক যত প্রকারের বিচ্যুতি বা বিভ্রান্তি বিদ্যমান তার সবকিছুর মূল কারণ আকীদার উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি। কুফ্‌র, শির্‌ক্, বিদ'আত, দলাদলি, বিভ্রান্তি ইত্যাদি সবকিছুর মূল কারণ বিশ্বাসের উৎস বা ভিত্তি নির্ধারণের বিষয়ে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা মতবিরোধিতা।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বিশ্বাসের বিষয়গুলি 'গাইব' বা অদৃশ্য জগতকে কেন্দ্র করে। আর অদৃশ্য জগতের বিষয়ে কোন কিছু সঠিকভাবে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী। যখনই কোন মানুষ ওহীর অস্তিত্ব বা গুরুত্ব অস্বীকার করে অথবা আকীদার বিষয়ে ওহীর অতিরিক্ত কোন সূত্র বা উৎসের উপর নির্ভর করে তখনই সে তার জন্য বিভ্রান্তির দরজা উম্মুক্ত করে দেয়। এজাতীয় বিভ্রান্তিকর উৎসের মধ্যে রয়েছে:

১. ওহীকে অস্বীকার করা (নাস্তিকরা তাই করে)।
২. ওহীকে অকার্যকর করা (ওহীর স্বাভাবিক ও সরল অর্থ প্রত্যাখ্যান করত রূপক অর্থ গ্রহণ করা, অথবা ওহীর নির্দেশনার একটি ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে অমুক গোষ্ঠির জন্য তা প্রযোজ্য নয় বলে দাবী করা। এ হলো মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ।)
৩. লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা ব্যক্তিগত পছন্দ। (ওহীর বদলে অন্যান্য উৎস তথা লোকাচার, ধর্মগুরুদের ইলহাম, কাশফ ইত্যাদিতে বিশ্বাস)।
৪. ওহীর তাফসীর এবং তাফসীরভিত্তিক যুক্তির উপর নির্ভর করে আকীদা পোষণ করা যা ওহীর মূল বক্তব্য নয়।
৫. ধর্মগুরু বা আলিমগণের মতামত :

মুসলিম উম্মাহ্‌র আকীদাগত বিভক্তি ও বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ পরবর্তী আলিমগণের বক্তব্যকে আকীদার উৎস হিসাবে গ্রহণ করা। মূলত শীয়া ফিরকার অনুসারীরাই প্রথমত ইমাম ও নেককারদের নিষ্পাপ হওয়া ও তাদের ইলমু লাদুন্নী, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির অভ্রান্ততার বিশ্বাস প্রচার করে। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতার দিনগুলিতে আরো অনেক সম্প্রদায়ে শীয়ারা বিভক্ত হয় এবং অনেক সাধারণ

নেককার মানুষও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হন। নিঃসন্দেহে ইসলামে আলিমগণের মর্যদা রয়েছে, তবে তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নন এবং তাঁদের মতামত কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে গ্রহণ করতে হবে। একজন আলিম বলেছেন বলেই তা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহুদী ও খৃষ্টানরা, বিশেষত শেষোক্তরা তাদের ধর্মগুরুদেরকে অভ্রান্ত বিশ্বাস করত তাদের মতামতকে দ্বীনের চুড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছে। ফলে তাদের কাছে ওহীর আর কোন মূল্য থাকে নি। কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টতার অভাব পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে কেবল সাহাবীগনের বা প্রথম তিন মোবারক প্রজন্মের বিশুদ্ধ হাদীস নির্ভর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করতে হবে। তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণের মতামত ও ব্যাখ্যাকে সম্মান ও চর্চার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা যায়, আকীদার ভিত্তি হিসাবে নয়।

৬. মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-কিয়াস :

আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'আকল' বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী বিভ্রান্তি বিদ্যমান। একদল মানুষ ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে 'আকল' কে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন। তারা দাবী করেছেন যে গাইবী বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে যা কিছু বলা হবে তাই বিশ্বাস করতে হবে, তা যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হোক। এর ফলে তারা মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক আজগুবি ও উদ্ভট বিষয়াদি উদ্ভাবন করত তা ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা নামে প্রচার করেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বিকৃত খৃষ্ট ধর্মের মূল বিষয় আল্লাহ্‌র একত্ব ও ত্রিত্বে বিশ্বাস করার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবাস্তব ধারণা এবং তাদের প্রায়শ্চিত্ববাদের উদ্ভট বিশ্বাস। অপর দল এর বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন। তারা ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'আকল'কেই প্রধান বলে গণ্য করেছেন। তাদের মতে ওহীর বিষয়টি সকলের কাছে বোধগম্য নয়, কাজেই ওহীর কোন্ বক্তব্য সঠিক ও কোন্‌টি রূপক বা ভুল তা আকল দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। এ যুক্তিতে তারা মানবীয় আকলকে গাইবী জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ আকলের নামে নিজ নিজ পছন্দ, অনুভুতি ও মতামতকে আকীদা বানিয়ে ফেলে। এদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিকগণ ও মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ফিরকা (যেমন মু'তাযিলা, কাদারিয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি)।

ইসলামের নির্দেশনা এই দুই অবস্থানের মাঝামাঝি ও সমন্বয়মূলক। ওহীর শিক্ষা জ্ঞানের সটিকত্ব প্রমাণ করে এবং জ্ঞানের নির্দেশনা ওহীর সঠিকত্ব প্রমাণ করে। মানবীয় জ্ঞান ওহীর যৌক্তিকতা বিচার ও অনুধাবন করবে, কখনই ওহীর স্থলাভিষিক্ত হবে না।

আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস-ইজতিহাদ ও যুক্তি-নির্ভরতার বিষয়ে ইমাম ইউসুফ (১৮২ হি) বলেন, "তাওহীদ বা আকীদা কিয়াস দ্বারা শেখা যায় না . . . .। কারণ কিয়াস তো চলে

এমন বিষয়ে যার তুলনা আছে ও নমুনা আছে। আর মহাপবিত্র আল্লাহ্‌র তো কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই। . . . ."

১.৩। ইসলামী আকীদার গুরুত্ব :

ইসলামী আকীদা পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি :

১. বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ।
২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ।
৩. বিভ্রান্তিকর আকীদাসমূহ, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাওহীদের ঈমান

২.১। আরকানুল ঈমান :

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে (যেমন ২:২৮৫, ৪:১৩৬ ইত্যাদি) ও 'হাদীসে-জিব্রীল' ইত্যাদি হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে ইসলামী আকীদা বা ঈমানের ছয়টি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে : ১. আল্লাহ্‌র উপর ঈমান, ২. ফিরিশতা বা মালাইকাগণের প্রতি ঈমান, ৩. আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, ৪. আল্লাহ্‌র রাসূলগণের প্রতি ঈমান, ৫. কিয়ামাত, পুনরুত্থান, পরকাল বা আখিরাতের উপর ঈমান, এবং ৬. তাক্‌দীর বা আল্লাহ্‌র নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের উপর ঈমান। এ বিষয়গুলোকে আরকানুল ঈমান বা ঈমানের মূল ভিত্তি তথা নীতি বলা হয়। এছাড়াও রাসূল (সা.) বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা আছে।

২.২। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান : তাওহীদের বিশ্বাস :

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহ্‌র একত্বে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মূল এবং সর্বপ্রধান স্তম্ভ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অর্থ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। (আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহ)।

২.২.১। তাওহীদের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর) অর্থ ও সংজ্ঞা :

শাব্দিক অনুবাদে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (লা - নেই বা মোটেও নেই; ইলাহ - উপাস্য, মাবুদ; ইল্লা - ছাড়া, ব্যতীত)।

ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ অনেক ব্যাপক, যা হচ্ছে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদাত পাওয়ার (উপাস্য বা মা'বুদ হওয়ার) অধিকার ও যোগ্যতা আর কারো বা কিছুরই নেই এবং তাঁকে ছাড়া আর যার বা যা কিছুর উপাসনা বা ইবাদাত করা হয় (তাগুত) তাদের সবাইকে ও সবকিছুকে অস্বীকার করা। বিভিন্ন হাদীসে এও যোগ করা হয়েছে, 'ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু' - অর্থাৎ তিনি একক এবং তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে উপাস্য ও মা'বুদ সমার্থক নয়। মা'বুদ বা ইবাদাত পাওয়ার অধিকার তাঁরই যিনি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারী। আর ইবাদাত হচ্ছে বান্দার পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির সমন্বিত অবস্থা, যে অবস্থায় নিজ কর্ম দ্বারা সে মা'বুদের (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি অর্জন করে। অপর পক্ষে যে কারো উপাসনা বা পুজা অর্চনা করা হয় তার কোন ক্ষমতা থাক বা না থাক, তাকেই উপাস্য বলা যেতে পারে।

২.৩। তাওহীদের প্রকারভেদ :

আকীদার উৎসের বিচ্যুতির কারণে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে, তাওহীদ অর্থ মহান আল্লাহকে একমাত্র অনাদি সত্তা বা একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করা। তাদের এ চিন্তা কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনের অগণিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের ও অন্যান্য জাতির কাফিরগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একত্বে বিশ্বাস করত এবং তাঁকেই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করত। বর্তমান যুগেরও অল্প কিছু নাস্তিকের মৌখিক অস্বীকৃতি ছাড়া বাকী সকল অমুসলিম জাতিও বিশ্বের একমাত্র একজন স্রষ্টার অস্থিত্বে বিশ্বাস করে। এটুকুতেই যদি তাওহীদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয় তবে তো আর তাদেরকে কাফির বলার প্রয়োজন থাকত না কিংবা কোন যুগেই নবী-রাসূলগণের আগমনের প্রয়োজন হত না।

কুরআন ও হাদীসের অগণিত বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসের একাধিক পর্যায় বা স্তর রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।" সূরা ইউসুফ-১২:১০৬। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের পর্যায় রয়েছে, যে কারণে ঈমানের সাথে শির্‌ক্ একত্রিত হতে পারে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করতে পারে। এ কারণে আলিমগণ তাওহীদকে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করেছেন। মূলত তিনটি ভাগে তাওহীদকে বিভক্ত করা হয়েছে :

১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব (তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ)
২. ইবাদাতের একত্ব (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ)
৩. নাম ও গুণাবলীর একত্ব (তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত)।

২.৩.১। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব :

এই পর্যায়ের তাওহীদকে জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদও বলা হয়। এর অর্থ বিশ্বের সকল কিছুর সৃষ্টি, প্রতিপালন, সংহার ইত্যাদির বিষয়ে আল্লাহ্‌র একত্ব। এতে বিশ্বাসের অর্থ এই যে, মহান আল্লাহ্‌ই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (রব্ব্)। তিনি ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করা, হেদায়েত বা পথভ্রষ্ট করা, বিপদ দান বা দূর করা, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করা, জান্নাত বা জাহান্নামে নিতে বা সেখান থেকে বের করতে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা ইত্যাদি ঘটাতে বা এসব বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম নয়, এ সকল কিছুর ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। এ ক্ষমতায় কেউ তার শরীক নয় এবং তিনি নিজেও কাউকে কখনো তাঁর এ ক্ষমতায় শরীক করেন নি। আল্লাহ্‌র নবীগণ, ওলীগণ, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ এ সকল বান্দাকে ভালবাসেন, দয়া করে তাদের

দু'আ ইচ্ছা করলে তিনি কবুল করেন, তাঁদেরকে ইচ্ছা করলে কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন, ইচ্ছা করলে তাঁদের সুপারিশ কবুল করতে পারেন; তবে কাউকে তিনি কোন ক্ষমতা দেন নি, তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ ফিরিশতাগণকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে কোন ক্ষমতা দেন নি। আর কোন মানুষকে তিনি কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব কিছুই দেন নি।

জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা মানুষ এই পর্যায়ের তাওহীদ বুঝতে ও বিশ্বাস করতে পারে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতেই মহান আল্লাহ্ বলেন, "সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র নিমিত্ত যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।" আরো দ্রষ্টব্য- ৭:৫৪, ২৫:২, ৫১:২৮)

অধিকাংশ কাফির এ পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত বা এখনও করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহ্র ইবাদাত করত এবং সাথে সাথে ফিরিশতাগণ, কোন কোন নবী, সত্য বা কল্পিত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা, তাঁদের মূর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা পাথরের ভক্তি করত, এদের সিজদা বা এদের প্রতি মানত করত। তারা কখনোই দাবী করত না যে এ সকল উপাস্য বিশ্বের কিছু সৃষ্টি করেছে বা প্রতিপালন করে। তবে তাদের একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস ছিল যে এসব উপাস্য সাধারণভাবে কিছু অলৌকিক নিষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা রাখে যা আল্লাহ্ তাদের দিয়েছেন। আল্লাহকেই যে তারা একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে মানত এ কথা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> "বল (হে মুহাম্মাদ সা.) আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক দান করেন? কে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবনশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করেন? বিশ্ব পরিচালনা করেন কে? তারা উত্তরে বলবে, আল্লাহ্। বল, তাহলে কেন তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করছ না? সূরা- ইউনুস ১০:৩১। (আরো দেখুন ১০:৩৪, ২৩:৮৪~৮৯, ২৯:৬১~৬৩, ৪৩:৯ ইত্যাদি)।

২.৩.২। তাওহীদুল উলুহিয়্যাত বা ইবাদাতের (তথা কর্ম পর্যায়ের) একত্ব :

ইবাদাত এর বাংলা প্রতিশব্দ দাসত্ব যা জাগতিক দাসত্বও বুঝাতে পারে। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় ইবাদাত একটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা কেবল উপাসনা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইবনে কাসীর বলেন, 'আভিধানিকভাবে ইবাদাত অর্থ ভক্তি, বিনয় বা অসহায়ত্ব প্রকাশ। আর শরী'আর ভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির সমন্বিত অবস্থাকে ইবাদাত বলা হয়।"

ইবাদাত তাঁর প্রতিই প্রযোজ্য যিনি চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারী অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্। বান্দার যে সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও মানসিক কর্ম আল্লাহ্ ভালবাসেন বা যদ্বারা

বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে সে সব কিছুই ইবাদাত। বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরই নির্দেশিত কর্ম ও তাঁর রাসূল (সা.) এর প্রদর্শিত পন্থার হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমেই ইবাদাত পালন করা হয়। ইবাদাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা, তাঁর নির্দেশিত কাজ (সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, কুরবানী তাওয়াক্কুল ইত্যাদি) করা এবং তাঁর কাছে ইহ-পরকালের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। কর্মের ইবাদাতের ভিতরের প্রত্যেকটি কাজও এক একটি ভিন্ন ইবাদাত। যেমন সালাতে রুকু, সিজদা ইত্যাদি। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা হচ্ছে শির্‌ক্।

তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ

তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ সকল প্রকার ইবাদাত যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা। কেউ যদি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেন এবং সাথে সাথে অন্য কারো বা কিছুর ইবাদাত করেন তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবেন না, কেননা আল্লাহ্‌র ইবাদাতের অর্থ বিশুদ্ধভাবে, একনিষ্টভাবে, নিষ্কলুষভাবে বা শিরকের কলুষতা থেকে মুক্তভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই, সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্টার সাথে বিশুদ্ধভাবে তাঁকেই ডাক।" সূরা মু'মিন- ৪০:৬৫।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> "আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি।" সূরা নাহ্‌ল- ১৬:৩৬। (আরো দ্রষ্টব্য- ২:২১, ৪:৩৬, ২:২৫৬, ৯৮:৫)।

এখানে তাগুতকে বর্জন করা বলতে তাগুতের ইবাদাত বর্জন করা বুঝানো হয়েছে। তাগুতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী বা মহা-অবাধ্য। কুরআনের পরিভাষায় তাগুতের অর্থ শয়তান। এ ছাড়া আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর যা কিছুর ইবাদাত বা উপাসনা করা হয় তাকে তাগুত বলা হয়। (তবে কারো অজান্তে বা অসম্মতিতে তার পুজা করলে তাকে তাগুত বলা হবে না। যেমন মৃত কোন পীর, ইমাম বা নবীর উপাসনা করলে তাঁরা দায়ী নন, সেক্ষেত্রে তাগুত হচ্ছে শয়তান, যে মানুষকে শির্‌কে প্ররোচিত করে)। এজন্য পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। আর এ হলো তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্ অর্থাৎ ইবাদাতের একত্ব বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

মক্কার কাফিররাও আল্লাহ্‌র ইবাদাত করত, কিন্তু তারা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করত না। মুশরিকগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌র শরীক দাঁড় করানোর যুক্তি ছিল, যেহেতু আল্লাহ্ অমুক ওলীকে ভালবাসেন সেহেতু তিনি তাকে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের শরীক বানিয়েছেন বা বিশ্ব পরিচালনার কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন, যার প্রমাণ তার মু'জিযা বা কারামত থাকা।

অতএব তাকে বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাওয়া যায় না বা শাফা'আত পাওয়া যাবে না এবং তাদের বাদ দিলে তাদের প্রতি বেআদবী করা হবে, যা ক্ষমার অযোগ্য। অতএব ইবাদাত ও আরজী তাদের মাধ্যমেই পেশ করতে হবে, যেমন মানব সমাজে একজন মন্ত্রীর মাধ্যমে মানুষ রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন জানায়। এরকম ভিত্তিহীন কল্পনার উপরই মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইবাদাতের তাওহীদই সকল রাসূল ও নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয়। তারা কেউই কেবল একথা বলতে আসেন নি যে, আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ইত্যাদি, বরং কুরআনে সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের ভাষা ছিল,

> "হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই।" (দেখুন ৭:৫৯, ৭:৬৫, ৭:৭৩, ৭:৮৫ ও ১১:২৫, ২৬, ৪৯, ৬১, ৮৪, ২১:২৫)

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্ স্বীকার করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে তাওহীদুল রুবুবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের তাওহীদ স্বীকার করা হয়ে যায়, কারণ ইবাদাত কেবল তাঁরই করা যায় যিনি একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এই দুই প্রকারের তাওহীদই কুরআনের সকল আলোচনার মূল বিষয়। কেননা এই উভয় প্রকারের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য।

২.৩.৩। 'তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত' তথা 'নাম ও গুণাবলীর' একত্ব :

'নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ' এর অর্থ দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ্ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম ও বিশেষণ বা গুণের উল্লেখ করেছেন। এ সকল নাম ও বিশেষণের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, সকল প্রকার বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র কোন কর্ম, গুণ বা বিশেষণ কোন সৃষ্ট জীবের কর্ম, গুণ বা বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই পর্যায়ের তাওহীদও গাইবী বিষয়, মানুষ যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর খুঁটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এ বিষয়ে দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। ফলে কিছু লোক আল্লাহ্‌র সকল গুণ অস্বীকার করেছে, কিছু লোক কতেক স্বীকার করেছে, বাকী অস্বীকার করেছে। মক্কার কাফিরগণ আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের তাওহীদে বিশ্বাস করলেও তাঁকে রাহমান বা রাহীম বলে বিশ্বাস করত না। তাই হুদাইবিয়ার সন্ধিতে তারা 'আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)' পর্যন্ত লিখতে রাজী ছিল, 'আর-রাহমানির রাহীম' অংশ বাদ দিয়েছিল। এ সকল বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এ বিষয়ে একমাত্র ওহীর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"বল (হে মুহাম্মাদ সা.), তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।" সূরা বানী ইসরাঈল- ১৭:১১০। (আরো দেখুন- ২৫:৬০, ৭:১৮০, ২০:৮, ৪২:১১)।

আসমা ও সিফাত-এর মূল নীতিসমূহ :

আল্লাহ্‌র নাম ও গূণাবলী যেগুলি আল্লাহ্ কুরআনে এবং রাসূল (সা.) হাদীসে সাব্যস্ত করেছেন সেগুলিকে কোন উদাহরণ ও প্রকৃতি বা ধরন নির্ধারণ ছাড়াই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নামের সাথে সিফাতও আছে, কিন্তু যে গুণাবলী শুধুই সিফাত হিসাবে সাব্যস্ত, সেগুলি নাম হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না।

আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ সা. যে নাম বা সিফাত সাব্যস্ত করেন নি তা আর কারো সাব্যস্ত করার অধিকার নেই। অন্য কোন সিফাতকে আল্লাহ্‌র সিফাত বলে সাব্যস্ত বা আল্লাহ্‌র সিফাত নয় বলে অস্বীকারও করা যাবে না, যেহেতু সে সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই জানানো হয় নি।

আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত যে পাঠ্যে নাযিল হয়েছে সেই পাঠ্য অনুযায়ী হুবহু মেনে নিতে হবে, এক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন কিংবা কোন অর্থ আরোপ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, "তাঁর সমতুল্য কোন জিনিষই নেই .... ।" সূরা আল-শূরা ৪২:১১।

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্বের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভ্রান্তি

আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত নিয়েই মুসলিম সমাজের অধিকাংশ বিভ্রান্তি ও বিভক্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্বের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে, ফলে বিভিন্ন ফিরকার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে মুসলিম সমাজে তিনটি মতবাদ বিস্তারলাভ করে :

১. মহান আল্লাহ্‌র বিশেষণের মানবীয়করণের মতবাদঃ

এ মতবাদের অনুসারীগণকে মুশাব্বিহা বা তুলনাকারী বলা হয়। এরা বিশ্বাস করত মহান আল্লাহ্‌র বিশেষণ ও কর্ম মানুষেরই মত এবং তিনি মানুষের মতই দেহধারী। শীয়া রাফিযী ফিরকার বিভিন্ন উপদলের মানুষেরা এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। প্রসিদ্ধ মুফাসসির আবুল হাসান ইবনু সুলাইমান বালখী (১৫০ হি:) এ মতের প্রচারক ছিলেন।

২. মহান আল্লাহ্‌র বিশেষণ অস্বীকার করার মতবাদঃ

এ মতবাদের প্রর্বতক ও অনুসারীরা আল্লাহ্‌র বিশেষণসমূহকে ব্যাখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে অস্বীকার করত। মূলত জাহমী ও মু'তাযিলী ফিরকার মাধ্যমে এই মতবাদের প্রবর্তন ও প্রচার ঘটে। জা'দ ইবনু দিরহাম (১১৮ হি.) নামক একজন নতুন প্রজন্মের পারসিক

মুসলিম মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করে তাঁকে 'নির্গুণ' বলে দাবী করতে থাকেন। তার ছাত্র জাহম ইবনু সাফওয়ান সামারকান্দী (১২৮ হি.) এ মতটিকে জোরালোভাবে প্রচার করতে থাকেন এবং এর সাথে অনেক দর্শনভিত্তিক মতবাদ প্রচার করেন।

জাহমের মতে যে সকল বিশেষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা কখনো স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে যে বিশেষণগুলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা . . . ইত্যাদি। কিন্তু সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য বিশেষণসমূহ যেমন জ্ঞান, ক্ষমতা, দয়া, ক্রোধ, কথা, শ্রবন, দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল, চক্ষু ইত্যাদির অধিকারী হওয়া, (আরশের) উপরে ওঠা, (প্রথম আসমানে) নেমে আসা ইত্যাদি বিশেষণ মহান আল্লাহ্‌র আছে বলে বিশ্বাস করলে তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। আর যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন "কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়" সেহেতু আল্লাহর ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষণ আরোপ করা যাবে না। কুরআন-হাদীসের কোন কথা দ্বারা এরূপ বিশেষণ বুঝা গেলে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র "অতুলনীয়ত্ব" প্রমাণের নামে তাঁর সিফাত বা বিশেষণগুলোকে অস্বীকার করেছে। জাহমীদের বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যার ধরন হচ্ছে, আল্লাহ্‌র হাত মানে তাঁর ক্ষমতা, তাঁর জ্ঞান থাকার অর্থ হচ্ছে তিনি মূর্খ নন ইত্যাদি।

মু'তাযিলী মতবাদে আল্লাহ্‌র সিফাত অস্বীকার

জাহমের সমকালীন সময়ে মু'তাযিলী মতবাদের উদ্ভব হয়। এরাও জাহমীদের মত আল্লাহ্‌র বিশেষণগুলোকে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত। তাদের বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহ্‌র সত্তার অতিরিক্ত কোন অনাদি-অনন্ত বিশেষণ বা কর্ম নেই। তাঁর সকল কর্ম ও বিশেষণ তাঁর সৃষ্টি মাত্র। সুতরাং তাদের মতে আল্লাহ্‌র কালামও তথা তাঁর কথা (যেমন কুরআনুল কারীম) আল্লাহ্‌র সিফাত নয় বরং সৃষ্ট বস্তু। তিনি যখন সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর জন্য 'সৃষ্টিকর্তা' নামক সিফাত বা বিশেষণটি জন্ম নিল।

এভাবে জাহমী ও মু'তাযিলীরা ইসলামী মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে একটি 'বিদ'আত' বা নব-উদ্ভাবিত বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটান যা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বিশ্বাসের মধ্যে ছিল না। সর্বোপরি এরূপ বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক।

চতুর্থ হিজরী শতকে **'আশায়িরী ও মাতুরিদী** মতবাদের জন্ম হয়। এই উভয় মতবাদেও আল্লাহ্‌র সিফাত বিষয়ে জাহমী ও মু'তাযিলীদের অনুরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, যদিও এই দুই মতের প্রবর্তকদ্বয় যথাক্রমে ইমাম আশ'আরী ও ইমাম মাতুরিদী ফিক্‌হী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফাকে অনুসরণ করতেন। আকীদার বিষয়ে তাঁরা ওহীর পরিবর্তে 'আকল' বা জ্ঞান ও

বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে তারাও আল্লাহ্‌র কয়েকটি (৮টি) বিশেষণ ছাড়া বাকী সকল বিশেষণ ব্যাখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে অস্বীকার করতেন। সেগুলি হচ্ছে (১) হায়াত বা জীবন, (২) কুদরত বা ক্ষমতা, (৩) ইলম বা জ্ঞান, (৪) ইরাদা বা ইচ্ছা, (৫) সাম'উ বা শ্রবণ, (৬) বাসার বা দর্শন, (৭) কালাম বা কথা এবং (৮) তাকবীন বা তৈরী করা। শারহুল- আকীদা নাসাফিয়া পৃ: ৫১-৬৫।

'সুনিশ্চিত', একীনী বা আকলী (বুদ্ধি-বৃত্তিক) দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার যুক্তিতে এ বিশেষণগুলো ছাড়া সকল বিশেষণকে ব্যাখ্যা করাকেই অধিকাংশ 'আশায়িরী-মাতুরিদী আলিম মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ্‌র হাত, মুখমণ্ডল, আরশের উপরে উঠা, অবতরণ, ক্রোধ, সন্তুষ্টি, ভালবাসা ইত্যাদি সকল বিশেষণই তারা রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. মহান আল্লাহ্‌র সিফাতের তুলনামুক্ত স্বীকৃতি - সাহাবী-তাবিয়ীগণের মত:

উপরে উল্লেখিত দুই প্রান্তিক ধারার মাঝে ছিলেন সাহাবীগণের অনুসারী মূল ধারার তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ, যাঁরা "আহলুস্ সুন্নাত ও জামা'আত" নামে পরিচিত। এ বিষয়ে তাঁদের মূল নীতি ছিল যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌র যে সকল বিশেষণ বা কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে তা সব কিছু বাহ্যিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস করা। যুক্তি তর্ক দিয়ে এগুলোর প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করা ও এগুলোকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনা করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হওয়ার ভয়ে এগুলো অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করাও নিষিদ্ধ। তাঁদের মতে গাইবী বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র নিশ্চিত উৎস হচ্ছে ওহী। এ ক্ষেত্রে 'আকল' বা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পূরক ও সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। ওহীর নিশ্চিত বক্তব্য আল্লাহ্‌র সিফাত বা বিশেষণের কথা বলেছে এবং মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিতে এগুলো অবাস্তব, অযৌক্তিক বা অসম্ভব নয়। কাজেই এগুলো সরল অর্থে বিশ্বাস করা আবশ্যক। ব্যাখ্যার নামে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অস্বীকার করা ওহী অস্বীকারের নামান্তর। ইমাম আবু হানীফা (র.) আল্লাহ্‌র সিফাত বিষয়ে আহলুস্ সুন্নাত ও জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অস্তিত্ব, অতুলনীয়ত্ব ও অনাদিত্ব:

ইমাম আবু হানীফা (র.) তাঁর 'ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে বলেছেন, "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর মত নন। তিনি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর নামসমূহ ও তাঁর যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাতসমূহ সহ। যাতী সিফাত অর্থ সত্তীয় বিশেষণ। মহান আল্লাহ্‌র যে সকল সিফাত তাঁর সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে ও চিরন্তনরূপে বিদ্যমান সেগুলিকে যাতী

বা সত্তাগত সিফাত বলা হয়। ফি'লী সিফাত অর্থ কর্মীয় বিশেষণ বা কর্মগত বিশেষণ। মহান আল্লাহ্‌র যে সকল সিফাত তাঁর ইচ্ছায় কর্মে পরিণত হয় সেগুলি ফি'লী সিফাত বা কর্মগত বিশেষণ। আল্লাহ্‌র সত্তীয় বিশেষণের মধ্যে আছে : হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম'উ (শ্রবণ), বাসার (দর্শন), ইরাদা (ইচ্ছা) ইত্যাদি। তাঁর ফি'লী সিফাতসমূহের মধ্যে আছে : সৃষ্টি করা, রিযক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা ও তৈরী করা ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র সকল বিশেষণই অনাদি, চিরন্তন ও অসৃষ্ট। তবে সত্তীয় ও কর্মীয় বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : কর্মীয় বিশেষণগুলি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন, তিনি যখন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, রিযক দেন, ক্রোধান্বিত হন, সন্তুষ্ট হন। বিশেষণ হিসাবে এগুলো অনাদি ও চিরন্তন (যেমন কোন কিছু সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি খালিক বা স্রষ্টা), তবে এগুলো তাঁর ইচ্ছায় নতুনভাবে কর্মে পরিণত হয়। এগুলো তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। তিনি কখনো ক্রোধান্বিত হতে পারেন, এবং কখনো ক্রোধমুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁর সত্তীয় সিফাত সেরূপ নয়, কারণ সেগুলো কখনো তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। যেমন আমরা বলতে পারি না যে তিনি যখন ইচ্ছা ক্ষমতাবান হন এবং যখন ইচ্ছা ক্ষমতাহীন হন। সকল বিশেষণই এরূপ।"

"মহান আল্লাহ্‌র সকল বিশেষণই সৃষ্ট প্রাণীদের বিশেষণের ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, শোনেন, কথা বলেন, তবে তাঁর দেখা, শোনা ও কথা বলা আমাদের দেখা, শোনা ও কথা বলা মত নয়। . . . ।"

মহান আল্লাহ্‌র কয়েকটি বিশেষ বিশেষণঃ

১. আল্লাহ্‌র কালাম বা কথা : আল্লাহ্‌র কথা বলার বিষয়টি কুরআন থেকে জানা যায়। মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ একমত যে, 'কালাম' বা 'কথা বলা' আল্লাহ্‌র অনাদি বিশেষণের একটি। কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম এবং তা সৃষ্ট নয়, বরং তা স্রষ্টার একটি বিশেষণ, কোনরূপ স্বরূপ বা কিরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন,
"কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার কালাম, মুসহাফগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ, হৃদয়গুলোর মধ্যে সংরক্ষিত, জিহ্বাসমুহ দ্বারা পঠিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ। কুরআন পাঠে আমাদের জিহ্বার উচ্চারণ (মানবীয় কর্ম হিসাবে) আল্লাহ্‌র সৃষ্ট, কুরআনের জন্য আমাদের লিখনি সৃষ্ট, কিন্তু কুরআন সৃষ্ট নয়।" - আল ফিকহুল আকবার।

জাহমী ও মু'তাযিলীগণ আল্লাহ্‌র কালাম বা কথাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে সৃষ্ট বলে দাবী করত। তারা দাবী করত কুরআন সৃষ্ট।

২. আল্লাহ্‌র হস্ত, মুখমণ্ডল, সত্তা, ক্রোধ, সন্তুষ্টি

কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইয়াদ (হাত), ওয়াজ্‌হ্ (মুখমণ্ডল), নফস (সত্তা) থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সবই তাঁর বিশেষণ, কোন 'স্বরূপ' বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাই এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা নিয়ামাত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহ্‌র বিশেষণ বাতিল করা। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি। তদ্রুপ তাঁর ক্রোধ ও তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ, আল্লাহ্‌র অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোন 'কাইফ' বা 'কিভাবে' প্রশ্ন করা ছাড়াই।

৩. আরশের উপর ইস্তাওয়া

আরবীতে কোন কিছুর উপরে 'ইস্তাওয়া' করা অর্থ তার ঊর্ধ্বে উঠা বা অবস্থান নেওয়া। মহান আল্লাহ্‌র আরশের উপরে অবস্থান বা আরশের ঊর্ধ্বে থাকার বিশেষণটি কুরআন ও হাদীস দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত। কুরআনে সাত স্থানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ আরশের উপরে ইস্তাওয়া করেছেন। ইমাম আবু হানীফা তাঁর 'ওয়াসিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন,

"আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ আরশের উপরে অবস্থান গ্রহণ করেন, আরশের প্রতি তাঁর কোনরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতা-উপবেশন ব্যতিরেকে . . . ।" আল - ওয়াসীয়্যাহ, পৃঃ ৭৭।

ইমাম মালিক (র.)-কে আল্লাহ্‌র আরশের উপরে ইস্তাওয়া বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,
"ইস্তাওয়া বা উপরে উঠা পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয়ে বিশ্বাস করা জরুরী।"

জাহমী-মু'তাজিলীগণ আল্লাহ্‌র আরশের ঊর্ধ্বে থাকা অস্বীকার করার জন্য দাবী করত আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতের সর্বত্র বিদ্যমান যেমন আত্মা দেহের সর্বত্র বিদ্যমান। অর্থাৎ তারা তাঁকে সৃষ্টির অংশ বানিয়ে ফেলেন। অথচ আল্লাহ্‌র সত্তা বিশ্ব জগতের সর্বত্র বিরাজমান বলার অর্থ এ কথা দাবী করা যে, মহান আল্লাহ্ বিশ্বজগতকে তাঁর সত্তার অভ্যন্তরে সৃষ্টি করেছেন! অথবা বিশ্ব জগত সৃষ্টির পরে তিনি এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন!! এগুলো সবই মহান আল্লাহ্‌র নামে ওহী-বহির্ভূত বানোয়াট অশোভনীয় ধারণা।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র.) বলেন,
"আল্লাহ্ আসমানে (ঊর্ধ্বে) এবং তাঁর জ্ঞান সকল স্থানে। কোন স্থানই মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বাইরে নয়।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ আরশের উপরে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির সব কিছুর নিকটবর্তী।

মহান আল্লাহ্কে ডাকতে হয় ঊর্ধ্বে, নিম্নে নয়। এই অর্থেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিকট একটি কাফ্রী দাসীকে নিয়ে আগমন করে বলে যে, তাকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এ দাসীকে মুক্ত করলে কি তার দায়িত্ব পালন হবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উক্ত দাসীকে বলেন, তুমি কি ঈমানদার? সে বলে হ্যাঁ। তিনি বলেন : আল্লাহ্ কোথায়? সে আসমানের দিকে ইশারা করে। তখন তিনি বলেন : একে মুক্ত করে দাও, এ নারী ঈমানদার।" - মুসলিম আস-সহী ২.৭০।

ইমাম আহমাদ বলতেন, "মহান আল্লাহ্ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত। . . . অধিষ্ঠিত অর্থ তিনি এর ঊর্ধে। মহান আল্লাহ্ আরশ সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই সবকিছুর ঊর্ধে। আরশকে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে আরশ সবচেয়ে মর্যদাময় সৃষ্টি এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপরে। আর মহান আল্লাহ্ আরশের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন এর অর্থ আরশ স্পর্শ করে অবস্থান করা নয়।"

৪. অবতরণ :

মহান আল্লাহ্র অন্য একটি বিশেষণ হচ্ছে 'নুযূল' বা অবতরণ। এ অর্থের একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

"প্রতি রাত্রে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। তিনি বলেন, আমাকে ডাকার কেউ আছে কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব।" বুখারী- ২:২৪৬, মুসলিম- ১৬৫৬।

এ বিশেষণও জাহমী-মু'তাযিলীরা অস্বীকার করেন। তারা বলেন, স্থান পরিবর্তন আল্লাহ্র অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক . . . , এখানে অবতরণ অর্থ নৈকট্য বা বিশেষ করুণা!

আহলুল সুন্নাহ্র ইমামগণ অন্যান্য বিশেষণের মত এই বিশেষণকেও তুলনাবিহীনভাবে মেনে নেন। তাঁরা বলেন : আমরা সরল অর্থে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ অতুলনীয়, তিনি আরশের ঊর্ধ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ কোনভাবেই কোন সৃষ্টির অবতরণের মত নয়। তাঁর অবতরণের পদ্ধতি, স্বরূপ ও প্রকৃতি কি তা আমরা জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না।

আল্লাহ্‌র বিশেষণ বিষয়ে চার ইমাম ও সালাফ সালিহীন

উপরের বর্ণনাসমূহে আমরা মহান আল্লাহ্‌র সিফাত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর মত জানতে পেরেছি। বস্তুত চার ইমামসহ 'সালাফ সালেহীন' বা ইসলামের প্রথম চার প্রজন্মের সকল বুজুর্গ একই আকীদা অনুসরণ করতেন।

ইমাম শাফি'য়ীর মতঃ

ইমাম শাফি'য়ীর ছাত্র রাবী ইবনু সুলাইমান বলেন, আমি শাফি'য়ীকে মহান আল্লাহ্‌র সিফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন,

"মহান আল্লাহ্‌র তুলনা বা নমুনা স্থাপন মানবীয় জ্ঞানের জন্য হারাম, তাঁকে সীমায়িত করা মানবীয় কল্পনার জন্য হারাম, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়া মানবীয় ধারণার জন্য হারাম, এ নিয়ে চিন্তা করা মানব প্রবৃত্তির জন্য হারাম, এর গভীরে যাওয়া মানব অন্তরের জন্য হারাম এবং সব বুঝে ফেলার চেষ্টা করা মানবীয় বুদ্ধির জন্য হারাম। মহান আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে বা তাঁর রাসূলের (সা.) জবানীতে তাঁর নিজের বিষয়ে যা কিছু উল্লেখ করে নিজেকে বিশেষিত করেছেন তা বিশ্বাস করা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু বৈধ নয়।" - ইবন কুদামা, যাম্মুত তাবীল পৃঃ ২৩।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের মতঃ

মহান আল্লাহ্‌র বিশেষণ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের মূলনীতি ও আকীদা ব্যাখ্যা করে তাঁর ছাত্র আবু বাকর খাল্লাল বলেন,

"আহমাদ ইবনু হাম্বালের মত এই যে, মহান আল্লাহ্‌র একটি 'ওয়াজ্‌হ' বা মুখমণ্ডল আছে। তাঁর মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতও নয়। বরং মুখমণ্ডল তাঁর একটি মহান বিশেষণ। . . . . তাঁর মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা আকৃতি নয়। যদি কেউ তা বলে তবে সে বিদ'আতী। তিনি বলতেন মহান আল্লাহ্‌র দুটি হস্ত বিদ্যমান। এ দুটি তাঁর সত্তার বিশেষণ। হস্তদ্বয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ নয়, দেহের অংশ নয়, দেহ নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা, সংযোজন, অঙ্গ-প্রতঙ্গ জাতীয় কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল। এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত মানুষের ব্যবহার থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না। . . . . আহমাদ (র.) বলতেন, আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি আছে। . . . . তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর সত্তার বিশেষণগুলির মধ্যে দুটি বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকে তাঁর অনাদি-অনন্ত জ্ঞানে যাদেরকে অবাধ্য বলে জানেন তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত রয়েছেন এবং তাঁর অনাদি-অনন্ত জ্ঞানে যাদেরকে অনুগত বলে জানেন তাদের

প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। মহান আল্লাহকে যারা দেহ বিশিষ্ট বলে দাবী করেন তিনি তাদের কথা অস্বীকার ও প্রতিবাদ করেন। কারণ নাম তো শরী'আহ এবং ভাষার ব্যবহার থেকে গ্রহণ করতে হবে। শরী'আতে মহান আল্লাহকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়নি আর ভাষার ব্যবহারে দেহ বলতে গতি, সীমা, দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা, অংশ আকৃতি ও সংযোজন ইত্যাদির সমাহার বুঝানো হয়। মহান আল্লাহ্ এর সব কিছুর ঊর্ধ্বে। কাজেই মহান আল্লাহ্র দেহ আছে বা তিনি 'সাকার' তথা দেহবিশিষ্ট এরূপ কথা বাতিল।" আহমাদ ইবনু হাম্বাল - আল-আকীদা, আবু বাকর খাল্লালের বর্ণনা, পৃ: ১০২-১১১।

আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী জানার আবশ্যকীয়তা :

নাম ও সিফাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র শ্রেষ্টত্ব ও মহত্ব জানা যায়। নাম ও সিফাত জানা না থাকলে কেউ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র মর্যাদা, শ্রেষ্টত্ব ও সত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারবে না। ফলে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা তথা ইবাদাত যথাযথভাবে করা সম্ভবই হবে না। এর ফলে আল্লাহ্র সত্তার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নেবে এবং মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে কুফর ও শিরকে পতিত হবে। এগুলোতে বিশ্বাস আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অংশ। সুতরাং কেউ অস্বীকার করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, তথা সে কাফির হয়ে যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়
রিসালাতের ঈমান

ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহ্‌র রাসূলগণে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্ যুগে যুগে মানব জাতির সঠিক পথের দিশা দানের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে অনেক মানুষকে মনোনীত করে তাঁদেরকে তাঁর বাণী দান করেন এবং মানুষদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বানের দায়িত্ব তাঁদেরকে দান করেন। এঁরা সবাই মহান চরিত্রের অধিকারী ও কল্যাণময় মানুষ ছিলেন। এঁরা সবাই তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। কুরআনে প্রাপ্ত ২৬ জন নবী-রাসূলগণের নাম ও বিবরণ ছাড়া আমরা বাকীদের নাম বিবরণ জানি না এবং উল্লেখিতগণ ছাড়া অন্য কাউকে নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্‌র নবীরূপে মনে করতে পারি না। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে সকল যুগে সকল জাতির কাছে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমরা এদের সবাইকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আমরা অনুসরণ করি ও তাঁর শরী'আত মত জীবন পরিচালনা করি।

রিসালাতের এই মৌলিক বিশ্বাসের সাথে আমাদেরকে শাহাদাতাইনের দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের এই সাক্ষ্য দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র আব্‌দ বা দাস এবং তাঁর রাসূল।

৩.১। রাসূলগণের প্রতি ঈমানের সামগ্রিক দিক ও তাঁদের বৈশিষ্ট :

৩.১.১। নবী ও রাসূল :

নবী-রাসূলগণ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র অপার করুণা হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। নবী ও রাসূল এই শব্দদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। তাই এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেছেন শব্দ দুটি সমার্থক, কেউ বলেছেন দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, যদি কোন ওহী প্রাপ্ত মানুষকে আল্লাহ্ নূতন বিধানাবলী বা শরী'আ দান করে তা প্রচারের নির্দেশ দান করেন তা হলে তাঁকে রাসূল বলা হয়। আর যদি তাঁকে শুধু ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণী দান করা হয়, নূতন কোন বিধান প্রচারের দায়িত্ব দেয়া না হয় তাহলে তিনি রাসূল নন, কেবলমাত্র নবী বলে আখ্যায়িত হন। যেমন ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ্ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁদেরকে কোন নতুন বিধানাবলী দান করেন নি, তাঁরা পূর্ববর্তী রাসূল মূসা (আ.) এর শরী'আ অনুসারে তাঁদের জাতিকে পরিচালিত করতেন। আসমানী দায়িত্ব লাভের প্রথম

পর্যায় নবীর দায়িত্ব লাভ এবং চুড়ান্ত পর্যায় রাসূলের দায়িত্ব লাভ। তাই সকল রাসূলই নবী ও রাসূল ছিলেন, কিন্তু সকল নবী রাসূল ছিলেন না।

৩.১.২। নবী-রাসূলগণের সংখ্যা :
নবী-রাসূলগণের সংখ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ কোন হাদীস গ্রন্থে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবী ইয়ালা মাওসিলী, ইব্‌ন হিব্বান ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন হাদীসে উদ্ধৃত নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩, ৩১৫, আট হাজার, ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ চব্বিশ হাজার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব হাদীস দুর্বল, এ জন্য সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উচিত বলে আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

৩.১.৩। নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন :
পূর্ববর্তী নবীগণকে অস্বীকার করার একটি কারণ ছিল যে কাফিররা ভাবত নবীগণ তো তাদের মতই মানুষ, কাজেই তাঁরা নবী হতে পারেন না। অপর দিকে কোন কোন বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের নবীদের মু'জিযা বা আলৌকিক কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁদের সম্পর্ক থাকার প্রমাণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। কুরআনে সকল বিভ্রান্তির অপনোদন করে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে নবীগণ মানুষ ছিলেন, তবে তাঁরা বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল না, বা নিজে থেকে তারা কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার অধিকারী ছিলেন না। (দ্রষ্টব্য- আয়াত- ৩:১৪৪, ১৪:১০-১১, ৬:৯১, ২১:৩, ২৩:২৪, ১২:১০৯, ১৬:৪৩, ১৪:৪, ২৫:২০, ৬০:৪ ইত্যাদি)।

৩.১.৪। সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ছিল এক :
তাওহীদ বা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াতই ছিল সকল নবী-রাসূলগণের দাওয়াত। সুতরাং সকলের প্রচারিত মূল ধর্ম ইসলাম, তবে তাদের বিস্তারিত বিধানাবলী বা শরী'আ যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

নবীগণের নিষ্পাপত্বও অভ্রান্ততা : কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহ্‌র মনোনীত নিষ্কলুষ নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে হেফাযত বা সংরক্ষণ করতেন, ফলে তারা বিভ্রান্তি বা পাপের মধ্যে নিপতিত হন না। বস্তুতঃ যাদের থেকে পাপ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে তো নিঃশর্ত ইত্তিবা বা অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ্ দিতেন না। তবে আলিমগণ কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে নবী-রাসূলগণের কোন ভুল হওয়ার বা তাদের দ্বারা কোন রকম কবীরা গুণাহ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও দুনিয়াদারী বা কর্মের ব্যাপারে তাদের ছোট খাটো ভুল ত্রুটি হয়ে যেতে পারে।

৩.১.৫। নবী-রাসূলগণের মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন (আয়াত) :
নবীগণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ওহীর মত মু'জিযা লাভ করতেন। কুরআনে মু'জিযার অনেক বর্ণনা আছে। নবীগণ তাঁদের নুবুওয়াতের দাবী প্রমাণ করতে এই মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতেন। নূহ (আ.)-এর নৌকা, মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপ হওয়া ও হাত সাদা হওয়া, ঈসা (আ.)-এর মৃতকে জীবিত করা ও অন্যান্য অনেক মু'জিযা এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইসরা, মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও অন্যান্য মু'জিযা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের মু'জিযার মত আওলিয়াগণের বিশুদ্ধ সনদে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য কারামাতেও বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। কারামাত প্রদর্শন করা আওলিয়াদের কোন ক্ষমতার বা মর্যাদার নিদর্শন নয়, সেটা কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই তারা প্রাপ্ত হতেন। এমনকি এটি ওলী হওয়ারও প্রমাণ নয়। কেননা একজন অবিশ্বাসীর মাধ্যমেও অলৌকিক কাণ্ড প্রকাশ পেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে তা কারামত বলা হয় না, তাকে ইসলামী পরিভাষায় ইসতিদরাজ বা তাদের কাজের প্রয়োজন মেটানোর বিষয় বলা হয়।

৩.১.৬। বিশ্বাসের সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য :
সকল নবী-রাসূলগণের প্রতি সমান বিশ্বাস ঈমানের দাবী, তাঁদের কাউকে অবিশ্বাস করলে ইমান থাকবে না। এমনকি তাঁদের কারো প্রতি সামান্যতম অমর্যাদামূলক কথাও বলা পাপ। কুরআনে উল্লেখ আছে, '(মু'মিনগণ বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না।' - সূরা বাকারা ২:২৮৫। তবে এটা জেনে রাখা দরকার যে, বিশ্বাস ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সাম্যের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের মধ্যে করো মর্যাদা করো চেয়ে বেশী বলে আল্লাহ্ জানিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "এই রাসূলগণ তাদের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি . . . ।" সূরা- ২:২৫৩ অনুরূপ- ১৭:৫৫। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)।

৩.২। মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতে বিশ্বাস করার অর্থ :
মুহাম্মাদ (সা.) কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত সত্য বলে বিশ্বাস করা। কুরআন কারীমে ও হাদীসে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর রিসালাতে বিশ্বাসের যে সকল দিক শিক্ষা দিয়েছেন তা নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

তাঁর নুবুওতে বিশ্বাসের দিক সমূহ :

৩.২.১। নুবুওতে বিশ্বাস : একজন মুসলিম সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করেন যে তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত নবী ও রাসূল। আল্লাহ্ বলেছেন,

"হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" সূরা আহযাব- ৩৩:৪৫-৪৬। অনুরূপ আয়াত ৫:৬৭।

৩.২.২। তাঁর নুবুওতের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস : 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বের সকল দেশের, সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্মের শরী'আ রহিত হয়ে গেছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন মানুষ মুক্তির দিশা পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

"আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।" সূরা সাবা- ৩৪:২৮। (আরো দ্রঃ ৭:১৫৮, ২১:১০৭)।

সহীহ হাদীসেও জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, ". . . পূর্ববর্তী নবীদেরকে পাঠানো হতো বিশেষভাবে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের জন্য আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য . . .।" বুখারী- ১:১৬৮।

সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মাদ (সা.) কোন নির্দিষ্ট যুগের বা বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত নবী তবে তিনি ইসলামের গণ্ডীতে প্রবেশ করতে পারবেন না যদিও তিনি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে বিশ্বাস করেন।

৩.২.৩। তাঁর দ্বারা খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তিতে বিশ্বাস : একজন মুসলিম এটাও বিশ্বাস করেন যে মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোন ওহী নযিল হবে না এবং কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র শেষ নবী। আল্লাহ্ বলেছেন,

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ; আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" সূরা আহযাব- ৩৩:৪০।

অসংখ্য হাদীসে, এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ের অর্ধশতাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলুল্লাহর (সা.) মাধ্যমে নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ". . . আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন।" সহীহ মুসলিম- ১.৩৭১। অন্য একটি হাদীসে আছে, আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "ইস্রাঈল সন্তানগণকে শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবী মৃত্যু বরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন. . . ।" সহীহ বুখারী- ৩.১২৭৩, মুসলিম- ৩.১৪৭১।

যদি কোন মুসলিম নামধারী নুবুওয়াত দাবী করে বা এরূপ দাবীদারের কথা বিশ্বাস করে তবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে। উপরন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (সা.) এর পরে কোন নবী বা রাসূল এসেছেন, আসতে পারেন, আসার সম্ভাবনা আছে বা আসা অসম্বব নয়, তবে সে ব্যক্তিও অমুসলিম কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে, যদিও সে মুহাম্মাদ (সা.)-কে একজন নবী ও রাসূল বলে মানে অথবা তাঁর শরীয়তের বিধান মেনে চলে। এই ব্যক্তি মূলত "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-য় বিশ্বাস করে নি, কারণ রাসূলের (সা.) ঘোষণা ও শিক্ষাকেই সে অস্বীকার ও অমান্য করেছে। এ সকল ভণ্ডের অন্যতম হচ্ছে পাঞ্জাবেব গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮) যে নুবুওতের দাবী করেছে এবং অনেক ভক্ত ও অনুসারীও পেয়েছে।

৩.২.৪। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস : একজন মুসলিম সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তাঁর নুবুওয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্‌র সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মাতকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কোন কিছুই তিনি গোপন করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

> "হে রাসূল (সা.) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহ্‌র বার্তা প্রচার করলে না।" সূরা মায়িদা- ৫:৬৭।

বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবীদের সামনে প্রশ্ন করেন : আমি কি আল্লাহ্‌র বাণী সকল প্রচার করেছি? সাহাবীগণ এক বাক্যে বলেন, হ্যাঁ। এর পর আল্লাহ্ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নযিল করেন:

> "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" সূরা মায়িদা- ৫:৩।

কুরআন ও আরো বিভিন্ন হাদীসের এরকম ঘোষণার পরও যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, রাসূল (সা.) কোন শিক্ষা গোপন রেখে গেছেন, কিংবা গোপনে কাউকে বিশেষ কিছু জানিয়ে গিয়েছেন অথবা ইসলামের যে শিক্ষা তিনি সবাইকে দান করেছেন তাতে অপূর্ণতা আছে, অথবা তাঁর পরে কেউ ইসলামের পূর্ণতা দান করতে পারে তা হলে তিনি "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এই বিশ্বাস করেন নি। বরং তিনি দাবী করছেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন নি (নাউযু বিলাহ!)।

৩.২.৫। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) শিক্ষার নির্ভুলতা : একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মাতকে

জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন সব কিছুই তিনি সত্য বলেছেন। তাঁর সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আল্লাহ্ বলেন,

> "(হে নবী সা.) তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনোই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে বিরাজিত সকল বিষয়ে তোমার বিধানের স্মরণাপন্ন হবে, তোমার দেওয়া বিধানের ব্যাপারে তাদের মনের গভীরে কোন আপত্তি অনুভব করবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তোমার বিধান মেনে নেবে।" সূরা নিসা- ৪:৬৫।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন

> "রাসূল (সা.) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" সূরা হাশর- ৫৯:৭। অনুরূপ আয়াত : ৫৭:২৮, ৬৪:৮, ৩৩:৩৬, ৪৮:১৩ ইত্যাদি।

অতএব, যদি কোন কথা বা শিক্ষা পবিত্র কুরআনে বা সহীহ্ হাদীসে আছে বলে আমরা জানতে পারি, তবে তাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করাই মুসলিমের দায়িত্ব।

৩.২.৬। রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য (ইতা'আত) : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ - এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের ঊর্ধ্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথাকে স্থান দেয়া। তাঁর আনুগত্যই ঈমানের আলামত। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> ". . . আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর, - যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।" সূরা আনফাল- ৮:১।

আল্লাহ্ আরো বলেন,

> "আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়, তবে সে ঐ সকল ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; তারা হচ্ছেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর সাথী হিসাবে তারাই উত্তম।" সূরা নিসা- ৪:৬৯।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ঈমানদারদের দায়িত্ব হলো সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ ও শিক্ষা অনুসারে। রাষ্ট্রীয় আদেশদাতার আনুগত্যের প্রশ্নেও কুরআন-হাদীসের নির্দেশকে মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'আদেশের মালিক' তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" সূরা নিসা- ৪:৫৯।

আরো দেখুন, অনুরূপ আয়াত- ৩:১৩২, ২৪:৫২, ৪:৮০, ২৪:৫৪ ইত্যাদি।

৩.২.৭। তাঁর অনুকরণ ('ইত্তিবা') : আনুগত্য ছাড়াও কর্মে ও বর্জনে কাউকে অনুকরণকে আরবীতে 'ইত্তিবা' বলা হয়। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও দাবী হলো কর্মে ও বর্জনে হুবহু তাঁর অনুকরণ করা। তাঁর নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করার সাথে সাথে তিনি যা যেভাবে করেছেন তা সেভাবে করা এবং তিনি যা বর্জন করেছেন (যদিও তিনি তা করতে পারতেন) তা বর্জন করা। কর্মে ও বর্জনে তাঁর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র (সা.) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" সূরা আহযাব- ৩৩:২১।

এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না তারা, অর্থাৎ শুধুমাত্র কাফিররাই রাসূলুল্লাহ্র আদর্শ গ্রহণ করে না বা তা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "(হে রাসূল সা.) বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু। বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তা হলে আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না।" সূরা আল ইমরান- ৩:৩১-৩২।

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বিশ্বাসের অর্থ হলো, প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক আনুগত্য ও অনুসরণ একমাত্র মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্য। কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্র আনুগত্যের ঊর্ধ্বে বা সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ্র (সা.) আনুগত্য ও অনুসরণ না করলেও তার চলে, অথবা তাঁর আনুগত্য-অনুকরণ ছাড়াও আল্লাহর নৈকট্যলাভ সম্ভব তা হলে সে ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যদিও সে কোন বিষয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করে।

৩.২.৮। রাসূলুল্লাহ্র (সা.) অনুকরণের ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী : রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুকরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোন কর্মের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে মু'মিন বিশ্বাস করেন না। আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাঁকে পেতে হলে, তাঁর বন্ধুত্ব, বেলায়াত, সওয়াব, প্রেম ও করুণা লাভ করতে হলে, তাঁর ইবাদাত করতে হলে, বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তাঁর ইবাদাত করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে, ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোন পদ্ধতিতে আল্লাহকে ডাকলে বা ইবাদাত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

"অতএব যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর) আদেশের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে, অথবা কোন কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।" সূরা নূর- ২৪:৬৩।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক হাদীসে তাঁর পথের বা আদর্শের বাইরে চলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁর রীতি, পদ্ধতি বা কর্মের বাইরে কোন কর্ম করলে তা আল্লাহ্ কবুল করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁর কর্মের বা আদর্শের বাইরে নব উদ্ভাবিত কর্ম বা পদ্ধতিকে 'বিভ্রান্তি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে আঈশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোন কর্ম যদি কোন মানুষ করে তা হলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত (আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না)।" মুসলিম-৩/১৩৪৩, বুখারী- ২/৭৫৩, ৯৫৯।

আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন,

"তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রীগণের নিকট গিয়ে তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে জানলেন। মনে হলো এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইবাদাত কিছু কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ্ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোন গোনাহ্ নেই, আর আমরা তো গোনাহ্গার উম্মাত, আমাদের উচিত তাঁর চেয়েও বেশী ইবাদাত করা)। তখন তাঁদের একজন বললেন : আমি সর্বদা সারা রাত জেগে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করব। অন্যজন বললেন : আমি সর্বদা (নফল) সিয়াম পালন করব, কখনোই রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন : আমি কখনো বিয়ে করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বললেন, 'তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখো! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝে মাঝে (নফল) সিয়াম পালন করি, আবার মাঝে মাঝে সিয়াম পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিয়ে করেছি এবং স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" বুখারী- ৫/১৯৪৯।

এখানে এ সকল সাহাবী মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তাঁরা তাঁর রীতি জেনেছিলেন এবং মেনেও নিয়েছিলেন, তবে তাঁদের নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নেক আমলের জন্য তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন। আমরা জানি, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করা নিষিদ্ধ নয়। হারাম দিবসগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালন করাও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের প্রয়োজনবোধ না থাকলে বা অসুবিধা থাকলে অবিবাহিত থাকাও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। এর কারণ আল্লাহ্র নৈকট্য, বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াবের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতির বাইরে বা অতিরিক্ত কোন রীতির অনুসরণ করা মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, কেবলমাত্র সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থেকে কর্ম করলে বোধ হয় প্রয়োজনীয় বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াব অর্জন সম্ভব হবে না। অবিকল সুন্নাত অনুসরণকারীর চেয়ে অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম রীতিটি তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, তাহাজ্জুদ খুবই ভাল ইবাদাত, কাজেই রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করার চেয়ে সারারাত এই মহান ইবাদাতে মশগুল থাকাই উত্তম। রাতের অনেকখানি সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করে কি লাভ? ইত্যাদি। আর একেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর 'সুন্নাতকে অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উপরের হাদীসের অনুরূপ একাধিক হাদীসে (আবু দাউদ- ২/৪৮, দারিমী- ২/১৭৯, আহম্মাদ- ৬৪৪১, ৬৬৬৪ ইত্যাদি) সুন্নাতের ব্যতিক্রমকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদ্ধতির ব্যতিক্রম, খেলাফ বা অতিরিক্ত কোন কর্ম, রীতি বা পদ্ধতিকে দ্বীনের অংশ বলে মনে করা, বা তা পালন না করলে দ্বীন, বেলায়াত, ভক্তি, সাওয়াব বা আখিরাতের মর্যদা কিছু পরিমাণ ব্যাহত হবে বলে ধারণা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদ্ধতি দ্বীনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে বিশ্বাস করার অর্থ সুন্নাত অপছন্দ করা। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.)-এর রিসালাতের পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয়। ফলে সে আর তাঁর সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে না।

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন সাধারণত নেক আমল বেশী করা ও বেশী সাওয়াব অর্জনের জন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে সকল খেলাফে সুন্নাতই 'সুন্নাত অপছন্দ করার' পর্যায়ে চলে যায়। এর একটি প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন। আমরা জানি যে, যে কোন দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনী-সীরাত আলোচনা করা বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে দরূদ-সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত সম্মত ইবাদাত এবং সাহাবী, তাবি'য়ী ও পরবর্তী কয়েক শতকের মুসলিমগণ সাধারণভাবে অর্থাৎ কোন বিশেষ পদ্ধতি ছাড়াই এই সুন্নাত অনুসরণ করেছেন। সপ্তম হিজরী শতাব্দী থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'জন্মদিন' উপলক্ষে বাৎসরিক 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নামক উৎসব উদ্‌যাপনের পদ্ধতি চালু হয়। কয়েক শতাব্দী পরে মীলাদ মাহফিলের প্রচলন ঘটে। মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, ঈদে মিলাদুন্নবী ও মীলাদ মহফিল 'বিদ'আত' বা নব-উদ্ভাবিত কর্ম। যারা এই অনুষ্ঠানদ্বয় জায়েয বলে পালন করেন তারা উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতিকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেন। অর্থাৎ কেউ যদি সাধারণভাবে সাহাবী-তাবি'য়ীনগণের মত দরূদ-সালাম পাঠ করেন, জীবনী আলোচনা করেন তথা তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মহফিল পালন না করেন তবে তারা তাকে কামিল মুত্তাকী মু'মিন বলে মনে করবেন না। এমন কি এও হয়ত ভাববেন, যত কিছুই কর না কেন, মীলাদ পালন না করে জান্নাতে যেতে পারবে না!

খেলাফে সুন্নাতের প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসার একটি বিশেষ দিক এই যে, এরূপ কর্মই মুসলিম উম্মাহর দলাদলি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। এভাবে মীলাদের পক্ষের ও বিপক্ষের দল সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভক্তির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মীলাদের পক্ষের দলের মধ্যেও দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শই পরিপূর্ণ, তিনি কখনোই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা করেন নি তা না করলে তার দ্বীনের কোন ক্ষতি বা অপূর্ণতা থাকবে।

৩.২.৯। রাসূলুল্লাহ্র (সা.) ভালবাসা : 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' - এ বিশ্বাসের আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যে, এ বিশ্বাস পোষণকারী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সকল মানুষের ঊর্ধ্বে ভালবাসবেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষ থেকে বেশী ভালবাসবে।" বুখারী- ১/১৪, মুসলিম- ১/৬৭।

এখানে বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালবাসা কোন মুখের দাবীর ব্যাপার নয়। তাঁর ভালবাসার অর্থ হলো তাঁর উপর ঈমান আনা, তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট মানুষ, সকল নবীর নেতা, সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা, তাঁর শরীয়াত ও তাঁর সকল আদেশ নিষেধ যথাযথ মেনে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা, এবং সবকিছুর উপরে তাঁকে সম্মান করা, তার জন্য বেশী বেশী সালাত ও সালাম পাঠ করা, তাঁর জীবনী, শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ ভালভাবে জানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। এভাবেই মুসলিমের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা গভীর হতে থাকে, তখনই জীবনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সকল মানুষের ঊর্ধ্বে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাঁকে ভালবাসতে সক্ষম হয় একজন মুসলিম।

৩.২.১০। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলুল বাইত ও সাহাবীগণ :

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালবাসা। তাঁর সাহাবীগণকে, তাঁর আহলুলবাইত (পরিবার ও বংশধরদের)-কে, তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এবং তাঁর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালবাসা তাঁরই ভালবাসার প্রকাশ। বিশেষত তাঁর সাহাবী ও আহলুল বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (আয়াত ৫৭:১০, ৪৯:৭, ৯:১০০, ৪৮:১৮, ৯:৮৮, ৫৯:১০ ইত্যাদি দ্র.)। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> "তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান করেন, এবং আল্লাহ্র ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে, আর আমার ভালবাসায় আমার

বাড়ীর মানুষদেরকে (পরিবার, বংশধর ও আত্মীয়দেরকে) ভালবাসবে।" তিরমিযী- ৫/৬৬৪।

অগণিত হাদীসেও সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এক হাদীসে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে, কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা (তাবি'য়ীন) এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা (তাবি-তাবি'য়ীন)। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।" নাসায়ী- ৫/৩৮৭।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।" বুখারী- ৩.১৩৪৩, মুসলিম- ৪.১৯৬৭।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে মুসলিমগণ সাহাবীগণের বিষয়ে নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন :

১. মানবজাতির মধ্যে নবীগণের পরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণের মর্যদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।
২. খুলাফয়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে। অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোন সাহাবীকেই কোন মু'মিন সামান্যতম অমর্যাদা, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারবে না।

৩.২.১১। রাসূলুল্লাহ্র মর্যাদা ও সম্মান : রিসালাতে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা.)-কে সম্মান করা। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানব জাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দা, তাঁর হাবীব ও তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা। নুবুওত প্রাপ্তির আগে ও পরে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে সকল অন্যায়, পাপ ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এ ছাড়াও আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআন কারীমের বহু আয়াতে তাঁর মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"নিশ্চয় আমি আপনাকে রাসূল বানিয়েছি কেবল বিশ্বজগতের জন্য রহমত-রূপে।" সূরা আম্বিয়া- ২১:১০৭।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন,

"নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যেন তোমরা (হে মানব জাতি) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহ্র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" সূরা ফাতহ্- ৪৮:৮৯। আরো দেখুন- ৪:১১৩, ১৭:৮৬-৮৭, ৩৩:৪৫-৪৬, ৩৩:৬, ৩৩:৫৩, ২৪:৬৩, ৪৯:১-৩, ৯৪:১-৪ ইত্যাদি।

একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"কিয়ামাতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, কবর ফুড়ে আমিই প্রথম পুনরুত্থিত হব, আমি প্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই প্রথম গ্রহণ করা হবে।" মুসলিম-৪.১৭৮২।

অনুরূপ আরো হাদীস - তিরমিযী আস্-সুনান-৪.১০৪, ৫.৩০৮, ৫.৫৪৬, আহম্মদ-৪.১২৭-১২৮, মুসলিম-১.২৮৮ ইত্যাদি)।

৩.২.১২। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদার বিষয়ে ওহীর অনুসরণ : মুসলিমগণের দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঠিক মর্যাদা নিরূপণে এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করা। কুরআন ও হাদীসে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ও আল্লাহ্র সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শেখানো হয়েছে। তাই নিজে থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ আমরা বা আলিমগণ যা কিছুই বলি না কেন তা সবই মানবীয় ইজতিহাদ। অথচ বিশ্বাস ও আকীদার ভিত্তি ওহী। মানবীয় কথাকে ওহীর সাথে সংমিশ্রণ করলে বা ওহীর মর্যাদা দিলে সীমালঙ্ঘন ঘটবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"খৃষ্টানগণ যেরূপ ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রসংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রসংসা করবে না। আমি তো আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলবে : আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।" বুখারী- ৩.১২৭১, ৬.২৫০৫।

পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাত তাঁদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে বলে কুরআনে অনেক স্থানে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

"হে কিতাবীগণ! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ্ আল্লাহ্র রাসূল (মাত্র) এবং তাঁর বাণী ('হও' নির্দেশ) যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং বলো না 'তিন' . . . ।"সূরা নিসা- ৪:১৭১।

লক্ষণীয় যে ঈসা (আ.)-এর প্রতি আরোপিত বিশেষণ 'কালিমা' ও 'রূহ' সম্পর্কে খৃষ্টানরা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করায় যে এর দ্বারা ঈসা (আ.) কে আল্লাহ্‌র সত্তার অংশ বুঝায়। ফলে তারা দাবী করে যে ইশ্বরের সত্তার তিনটি ব্যক্তিত্ব - 'আল্লাহ্ বা পিতা', 'কালিমাতুল্লাহ্ বা ইবনুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পূত্র এবং রূহুল্লাহ্ বা পবিত্র আত্মা। এই তিন ব্যক্তি সমন্বয়ে এক ইশ্বর (নাউযুবিল্লাহ্)। অথচ তাদের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাভিত্তিক আকীদা বাইবেলেও কোথাও নেই। আর তারা এটা এই ভেবে করে যে এতে ঈসা (আ.) এর মর্যাদা বৃদ্ধি করবে!

রাসূল (সা.) এই জন্য তাঁর উম্মাহ্‌কে বার বার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন যেন আল্লাহ্ তাঁর বিষয়ে যে শব্দ ও উপাধি ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে। তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে আবেগ-বিবেকের ভিত্তিতে বাড়াবাড়ি করার কোন সুযোগ নেই।

৩.২.১২.১। তাঁর মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক : কুরআন-হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্যদের মতই মানুষ। আবার কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনেক মু'জিযা বা অলৌকিক কর্ম ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সাহাবীগণ, তাবি'য়ী ও তাবি'-তাবি'য়ীগণ এবং আহলুল সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'তের অনুসারীগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনরূপ বৈপরিত্য কল্পনা করেন নি। তাঁরা সর্বান্তকরণে সকল আয়াত ও হাদীসকে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (সা.) মানুষ ছিলেন তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য মহান আল্লাহ্ তাঁকে অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট প্রদান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে দুটি বিভ্রান্তিকর মতবাদ তৈরী হয়। প্রথম মতের প্রবক্তা দ্বিতীয় হিজরী শতকের মু'তাযিলা ও সমমনা ফিরকাসমূহের আকীদার মূল ছিল এই যে, রাসূল (সা.) একান্তই একজন মানুষ ছিলেন, এবং কুরআন ছাড়া অন্য কোন মু'জিযা তিনি দেখান নি।

দ্বিতীয় মতটি অনেক পরে ৭ম-৮ম হিজরী শতকে জন্মলাভ করে। এই মতের প্রবর্তকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মু'জিযা ও অলৌকিক কর্ম ও বৈশিষ্ট বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহকে তাদের আকীদার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এবং এর ভিত্তিতে তারা তাঁর মানবত্ব বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। তাদের মতামতের মূল কথা এই যে তিনি মূলত মানুষ ছিলেন না, প্রকৃত পক্ষে অলৌকিক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একান্তই রূপক অর্থে বা দাওয়াতের প্রয়োজনে তাকে মানুষ বলা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার দাবী করে বসেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রকৃতপক্ষে মানুষ বা মাটির মানুষ নন, তিনি আসলে নূর এবং নূরেরই তৈরী। এর সপক্ষে তারা কুরআনে বর্ণিত সূরা মায়িদা ৫:১৫ আয়াত " . . . আল্লাহর নিকট থেকে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে।" - এই আয়াত এবং নীচের জাল হাদীসটি ব্যবহার করেন। মুফাসসিরগণের মতে এখানে নূর অর্থ ইসলাম বা জ্ঞানের আলো। জাল হাদীসটি হচ্ছে,

"সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেন . . . ।"

এর পর এই লম্বা হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, এই নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরশী, লওহ্, কলম, ফিরিশতা, জিন, মানুষ ও সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়। . . .

প্রকৃত পক্ষে এই তথাকথিত হাদীসটি সিহা সিত্তাহ কিংবা দুর্বল হাদীসের কোন সংকলনেও পাওয়া যায় না এবং সকল মুহাদ্দীসগণ এই হাদীসটি যে বাননোয়াট সে ব্যাপারে একমত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মানবত্ব সম্পর্কে কুরআনে অনেক স্পষ্ট আয়াত আছে যেগুলি রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করার কোনই সুযোগ নেই। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "বল (হে মুহাম্মাদ সা.) আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র, আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ একমাত্র একই মা'বুদ। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" সূরা কাহাফ- ১৮:১১০। অনুরূপ আয়াত- ৪১:৬, ১৭:৯৩-৯৪।

বহু হাদীসও আছে যাতে আল্লাহর রাসূল (সা.) বার বার নিজেকে একজন 'মানুষ মাত্র' এবং আল্লাহর দাস হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বুখারী- ১.১৫৬, ২.৬৬৭, ৬.২৫৫৫, মুসলিম- ৩.১৩৩৭, ১.৪০০, ৪.১৮৩৫, ৪.২০০৭ ইত্যাদি।

বস্তুত নূরের তৈরী হওয়ার মধ্যে কোন অতিরিক্ত মর্যাদা আছে বলে মনে করাই ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। সৃষ্টির মর্যাদা তার সৃষ্টির উপাদানে নয়, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদায় এবং তার নিজের কর্মে।

তাই 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নূরের তৈরী' বলে বিশ্বাস করাকে ঈমানের অংশ বানানো, অথবা এ কথা অস্বীকার করাকে কুফ্রী বলে গণ্য করা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের পদ্ধতি অনুসরণ করা।

৩.২.১২.২। তাঁর ইল্ম বিষয়ক বিতর্ক : কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে একমাত্র মহান আল্লাহ্ই অদৃশ্য বা গাইবী জ্ঞানের অধিকারী বা 'আলিমুল গাইব'। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইবী ইলমের অধিকারী নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ইলমুল গাইব জানতেন না। কেবলমাত্র যে জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আসত তিনি তাকেই অনুসরণ করতেন ও প্রচার করতেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "বল (হে রাসূল সা.) আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই গাইব বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" সূরা নম্‌ল- ২৭:৬৫।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

> "বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গাইব (এর জ্ঞান) জানতাম তাহলে প্রকৃত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।" সূরা আরাফ- ৭:১৮৮। এরকম বহু আয়াতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ৬:৫৮, ১৮:২৬, ১১:১২৩, ৩১:৩৪, ৫:১০৯, ১০:২০, ৬:৫০, ৪৬:৯, ২১:১০৭-১১১, ৯:১০১ ইত্যাদি।

অনেক বিশুদ্ধ হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইলম ছাড়া আর কোন গাইবী জ্ঞান তার ছিল না।

অথচ ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোন কোন আলিম দাবী করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সামগ্রিক ইলমুল গাইবের অধিকারী ছিলেন, বা তিনি 'আলিমুল গাইব' ছিলেন। এই মর্মে একটি সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসও প্রচলিত হয়। এই জাল হাদীসে বর্ণনা করা হয়, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন। . . . . ।" সুতরাং কিছু বিভ্রান্ত লোকের ধারণা যে তিনি 'আলিমুল গাইব' ছিলেন তা শির্‌ক্ এর নামান্তর, কেননা এ সিফাত কেবল আল্লাহ্‌র বেলায়ই প্রযোজ্য।

৩.২.১২.৩। তাঁর হাযির-নাযির প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক : রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইলমুল গাইবের দাবির আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে তাঁকে হাযির-নাযির বলে দাবী ও বিশ্বাস করা। হাযির ও নাযির শব্দ দুটি আরবী শব্দ। হাযির অর্থ উপস্থিত, নাযির অর্থ দর্শক বা সংরক্ষক। হাযির-নাযির বলতে বুঝায় সদা বিরাজমান (তথা সদা সর্বত্র উপস্থিত) এবং সদা সর্বদা সব কিছুর দর্শক। স্বভাবতই এমন সত্তা সর্বজ্ঞ ও সকল যুগের সকল স্থানের সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে হাযির-নাযির দাবী করেন তারা বিশ্বাস করেন যে, তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, উপরন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

অথচ এই গুণটিও কেবল আল্লাহ্‌র বেলায়ই প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ্ বারংবার বলেছেন, বান্দা যেখানেই থাক তিনি (নিজ জ্ঞানের দ্বারা) তার সাথে বা অতি নিকটে আছেন। কুরআন বা হাদীসে কোথাও বলা হয় নি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বদা উম্মাতের সাথে অথবা সর্বত্র আছেন কিংবা সবকিছু দেখেন। প্রকৃতপক্ষে কিছু বিভ্রান্ত লোক কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরী করে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য হয়ত বা এই ছিল যে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবে

তারা ওহীর নামে মিথ্যা বলেছেন। কেননা সর্বপ্রকারের ইলমুল গাইবের অধিকারী হলে এবং সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান হলে নুবুওয়াত, ইসরা, মি'রাজ, হিজরত, হজ্জ, উমরা ইত্যাদি সবই অর্থহীন হয়ে যায়।

৩.২.১২.৪। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে বিতর্ক : কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা একাধিক যায়গায় ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'

এই সাধারণ ঘোষণা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর বিষয়ও একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" সূরা যুমার- ৩৯:৩০।
>
> "মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছেন। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ট প্রদর্শন করবে? . . . .।" সূরা আল-ইমরান- ৩:১৪৪ (উহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গে)।

কুরআনে নবী-রাসূলগণের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছু বলা না হলেও এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত, তাঁরা সালাত আদায় করেন।" (আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আল মুসনাদ ৬/১৪৭ ও বাইহাকী, সহীহ সনদ)।

মি'রাজ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীকে সালাতরত অবস্থায় দেখেছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে নবীগণসহ নিজে সালাত আদায় করেছেন। (বাইহাকী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"যখনই কোন মানুষ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ্ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন, যেন আমি তার সালামের প্রতি উত্তর দিতে পারি।" আবু দাউদ, আস-সুনান- ২/২১৮।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করলে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করে তা হলে আমাকে (ফিরিশতাগণ দ্বারা) জানানো হয়।" বাইহাকী।

উপরের হাদীসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পরে তাঁকে এক প্রকারের জীবন দান করা হয়েছে। এই জীবন বারযাখী জীবন, যা একটি বিশেষ সম্মান

ও গাইবী জগতের একটি অবস্থা। এ বিষয়ে হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই বিশ্বাস করতে হবে এবং বলতে হবে, এর বেশী কিছু বলা যাবে না, অনুমান করারও কিছু নেই, কেননা যতটুকু আমাদের জানা প্রয়োজন ততটুকুই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।

কিন্তু বর্তমান যুগে কেউ কেউ এ বিষয়ে ওহীর অতিরিক্ত কথা বলেন, এবং সেগুলিকে 'আকীদা' বা বিশ্বাসের অংশ বলে গণ্য করেন। এরকম বিষয়গুলির অন্যতম হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও নবীগণের ওফাত পরবর্তী এই বারযাখী জীবনকে পার্থিব বা জাগতিক জীবনের মত মনে করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর রওযার পাশে গিয়ে বিপদ-মুক্তি বা পাপ মোচনের জন্য দু'আ চাওয়া যায়। এর সমর্থনে তাদের সকল ব্যাখ্যা, যুক্তি ও বক্তব্যই সাহাবীগণের মতামত ও কর্মধারার বিপরীত।

সহীহ্ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁকে কখনই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁরা তাঁর পরামর্শ, অনুমতি ও দু'আ চাইতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পরে কখনোই কোন সাহাবী তাঁর রওযায় দু'আ, পরামর্শ বা অনুমতির জন্য আসেন নি, যদিও তাঁরা বহু সমস্যায় পড়েছেন, বিপদগ্রস্ত হয়েছেন বা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন। আবু বকর (রা.) এর খিলাফাত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ্। একদিকে বাইরের শত্রু, অপর দিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী ও তাদের অনুসারী। এ ছিল মুসলিম উম্মাহ্র অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্য আবু বকর (রা.) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর রাওযায় গিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ বা দু'আ চান নি। এমনকি আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্যও রাওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোন অনুষ্ঠান করেন নি। আলী (রা.) ও আমীর মুআবিয়া (রা.) এর যুদ্ধে লিপ্ত হবার পর কিংবা উম্মুল মু'মিনীন 'আঈশা (রা.) এর সাথে বিরোধের সময় তাঁরা কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর রওযায় এসে কোন সাহায্য বা পরামর্শ চান নি, যদিও এসব যুদ্ধে অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছেন।

কুরআন বা হাদীসে কোথাও ঘুণাক্ষরেও নির্দেশ দেয়া হয় নি যে, তোমরা বিপদে পড়লে রওযা শরীফে যেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট দু'আ চাইবে। এমন কি এ ব্যাপারে কোন জাল হাদীসেরও অস্তিত্ব নেই যে কোন সাহাবী রওযায় গিয়ে কখনো বলেছেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমি পাপ করেছি, তাওবা করছি, আমার জন্য ক্ষমা চান। তারা এটা করেছেন কেবল তাঁর জীবদ্দশায়। সাহাবীগণের যুগের অনেক পরে কোন কোন মানুষের মধ্যে এরকম কর্ম প্রকাশ পেয়েছে। এটা ইসলামী আকীদার পরিপন্থী।

৩.২.১২.৫। ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক : মহান আল্লাহ্ বিশ্ব পরিচালনা বা কারো মঙ্গল অমঙ্গলের ক্ষমতা বা দায়িত্ব নবী-রাসূলগণকে বা কাউকেই দেন নি। মহান আল্লাহ বলেন,

> "বল (হে রাসূল সা.) আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপরেও আমার কোন অধিকার নেই।" সূরা আরাফ- ৭:১৮৮।

অনুরূপ আরো আয়াত দেখুন- ৭২:২১-২, ৬:১৭, ৬:৬৩-৬৪, ১০:৪৯, ১০:১০৭, ২৭:৬২, ১৩:৪০ ইত্যাদি।

এরূপ বহু সংখ্যক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে একটি আয়াতেও মহান আল্লাহ্ বলেন নি যে, আমি বিপদ ত্রাণের বা দুঃখ কষ্ট দূর করার দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতা মুহাম্মাদ (সা.) বা অন্য কোন নবী, নবী বংশের ইমাম বা কোন ওলীকে প্রদান করেছি।

অথচ মুসলিম উম্মাহ্র অবনতির দিনগুলিতে কোন কোন আলিম এ সকল আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দাবী করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবিত ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থায় তাঁকে আল্লাহ্ কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। আর এ বিষয়টিকে তাঁরা মু'মিনের ঈমানের অংশ বানিয়ে নেন। এরূপ দাবীর ভিত্তিতে তারা দাবী করেন যে, বিপদে আপদে রাসূল (সা.)-এর কাছে সাহায্য প্রর্থনা করতে হয় এবং তিনি যাকে ইচ্ছা অলৌকিকভাবে সাহায্য করতে ক্ষমতা রাখেন।

রাসূল (সা.)-এর কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা থাকলে তো সাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে গিয়ে বলতেন, আপনি আমাদের বিপদ কমিয়ে দিন। তাঁর জীবদ্ধশায় তারা তাঁর কাছে দু'আ চেয়েছেন। কিন্তু কখনো তাঁর রাওযায় গিয়ে তার কাছে স্বাভাবিক দু'আও চান নি, বিপদ আপদ কাটিয়ে দেবার কথা বলা তো দূরের কথা।

চতুর্থ অধ্যায়
মালাইকা, আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহ ও আখিরাতে বিশ্বাস

৪.১। মালাইকা বা ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান

মালাইকা বা ফিরিশতায় বিশ্বাস ঈমানের একটি মৌলিক অঙ্গ।
আরবী ভাষার 'মালাক' শব্দকে ফার্সী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফার্সী শব্দই প্রচলিত। মালাইকা হচ্ছে মালাক এর বহুবচন, অর্থাৎ ফিরিশতাগণ বা মালাকগণ। অন্যান্য গাইবী বিষয়ের মত ফিরিশতা সম্পর্কিত সকল জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে গাইবী বিষয় এবং এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস কেবল ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যতটুকু কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহর মালাইকা বা ফিরিশতাগণে বিশ্বাসের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে : "সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ আমান্য করার কোন অনুভূতি তাদের মধ্যে নেই। সর্বদা আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা, তাঁর নির্দেশে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্ম।

ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাসে বিস্তারিত চারটি দিক রয়েছে :

৪.১.১। মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস :
ফিরিশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস হচ্ছে এটা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে স্বীকার করা যে তারা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি এবং অদৃশ্য জগতের বাসিন্দা। তাঁদের সৃষ্টি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবলী, কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই মু'মিন আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করেন।

৪.১.২। **মালাকগণের নামে বিশ্বাস :**
আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে তাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। যেমন সহীহ্ বুখারী- ৩/১১৭৩ ও মুসলিম-১৪৬-১৫০ আছে।

"বাইতুল মা'মুরে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করেন, যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা আর কখনো তথায় ফিরে আসে না।"
সুনানে তিরমিযীতে (৪/৫৫৬) আছে, ". . . আকাশে এমন ৪ আঙ্গুল স্থানও খালি নেই যেখানে একজন ফিরিশতা তাঁর কপাল রেখে আল্লাহর জন্য সাজদাবনত নেই।"

এদের মধ্য থেকে সামান্য কয়েকজনের নাম আমরা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। যেমন জিব্রাঈল, মীকাঈল ও মালিক (যিনি জাহান্নামের প্রহরী) নামগুলি কুরআনে এসেছে। (২:৯৮ ও ৪৩:৭৭ দ্রঃ)
কোন কোন মালাককে আল্লাহ্ তাদের কর্মভিত্তিক নামে উল্লেখ করেছেন। যেমন 'মালাকুল মাওত', 'মুনকার-নাকির', কিরামান-কাতিবীন ইত্যাদি। পূর্বোক্ত তিন ফিরিশতার নামের সাথে হাদীসে ইসরাফীল ফিরিশতার নামও এসেছে, যিনি কিয়ামাতের প্রাক্কালে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। 'মালাকুল মাওত'কে কোন কোন মুফাস্সির 'আযরাঈল' নামে উল্লেখ করেছেন। ফিরিশতাগণের মধ্যে জিব্রাঈলকে কুরআনে 'রুহুল আমীন' বা বিশ্বস্ত/পবিত্র আত্মা হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তাঁর শক্তি ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.১.৩। **মালাকগণের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশ্বাস :**
কুরআনে আদম সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে ফিরিশতাগণ মানবজাতির পূর্বে সৃষ্ট। তাঁরা আল্লাহ্র সম্মানিত ও অনুগত বান্দা। মক্কার কাফিরগণ তাঁদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য পাওয়ার ধারণায় তাদের ইবাদত করত। অথচ আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

কুরআনে মালাকগণের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি, তবে হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁরা নূর বা আলো থেকে তৈরী (মুসলিম-৪/২২৯৪)। তাঁদের আকৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানানো হয় নি, তবে তাদের পাখা আছে বলে সূরা ফাতির এর প্রথম আয়াতে (৩৫:১) উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের পাখার আকৃতি বা সংখ্যা সম্বন্ধে কুরআনে কিছু বলা হয় নি। তবে হাদীসে আছে জিবরীল (আ.)-এর পাখার সংখ্যা ৬০০। (বুখারী-৩.১১৮১, ৪.১৮৪০, ১৮৪১, মুসলিম- ১/১৫৮)।

কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা এও জানতে পারি যে ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। যেমন জিবরীল (আ.)-কে আল্লাহ্ ঈসা (আ.)-এর মাতা মারইয়ামের কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্র (সা.) কাছেও মানবাকৃতিতে তিনি এসেছিলেন সাহাবীদেরকে দ্বীনশিক্ষা দিতে (মুসলিম- ১)। লুত (আ.)-এর কাছে ফিরিশতাগণ সুন্দর বালকের আকৃতি নিয়ে এসেছিলেন। কুরআন ও হাদীসে তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত এ সকল বর্ণনা আমাদের হুবহু বিশ্বাস করতে হবে, অতিরিক্ত কিছু কল্পনার সুযোগ নেই।

৪.১.৪। মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস :
মালাইকা বা ফিরিশতাগণ মানবীয় দূর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা-বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করেন, যেমন :

ক. আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক ইবাদাত ও তাসবীহ ঘোষণায় ব্যস্ত থাকা।
" . . . তারা দিবারাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না।" সূরা আম্বিয়া- ২১:২০। (অনুরূপ : ৭:২০৬, ৬৬:৬ দ্রঃ)
খ. নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ্‌র ওহী পৌঁছানো। (জিবরীল আ. এর দায়িত্ব)
গ. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ। (আয়াত ১৩:১১ দ্রঃ)
ঘ. মানুষকে কল্যাণকর্মে উৎসাহ প্রদান (তিরমিযী- ৫:২১৯)
ঙ. মু'মিনদের জন্য দু'আ করা (সূরা মু'মিন- ৪০:৭-৯)
চ. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা (সূরা কাফ- ৫০:১৭-১৮)
ছ. মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ (সূরা সাজদা- ৩২:১১ ইত্যাদি)
জ. আল্লাহ্‌র আরশ বহন (সূরা হাক্কা- ৬৯:১৭)
ঝ. অন্যান্য কর্ম : উপরোক্ত দায়িত্বসমূহ ছাড়াও কুরআন ও হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রাক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মালাককে দায়িত্ব দিয়েছেন। মহাকাশ ও চাঁদ-সূর্যের জন্য পাহাড়-পর্বতের জন্য, মেঘ-বৃষ্টির জন্য, মাতৃগর্ভের ভ্রুণের জন্য, জাহান্নাম ও জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাপাচারীদের শাস্তি ও পূণ্যবানদের খেদমতের জন্য বিভিন্ন মালাককে আল্লাহ্ দায়িত্ব দিয়েছেন।
মুসলিমদের যিকির-ইবাদাতের মজলিসে কিছু মালাক উপস্থিত থাকেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করেন, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে রাসূল (সা.)-এর জন্য প্রেরিত সালাম ও সালাত তাঁর রওযায় পৌঁছে দেন কিছু মালাক, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে আছেন মুনকার ও নাকির মালাক। এভাবে মিকাঈল আছেন বৃষ্টিপাত ও ফল ফসলের দায়িত্বে, ইস্রাফীল আছেন শিঙ্গা ফুঁকার দায়িত্বে, মালিক ফিরিশতা আছেন জাহান্নামের দায়িত্বে।

সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে, সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র নিয়ম ও নির্দেশ বাস্তবায়নে ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র দাস হিসাবে নিয়োজিত এটাই মু'মিনগণের বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, ক্ষমতা দেন নি, যদিও কাফিররা তাঁদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশ্বাস করে তাঁদের ইবাদাত করেছে। সকল ক্ষমতা ও ইচ্ছার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। ইহ-পরকালে মালাকগণ মু'মিনদের কল্যাণকামী ও সাহায্যকারী - এই বিশ্বাস মু'মিনকে ইহ জীবনে নিরাপত্তাবোধ দান করে ও আশ্বস্ত করে। এ ছাড়া মালাকগণের উপর ঈমান আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মহত্ব, বিশালত্ব ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান দান করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে সূরা ফুসসিলাতে বলেন,

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্', তৎপর (সেই বিশ্বাসে) অবিচলিত ও অটল থাকে, তাদের প্রতি (সময় সময়) ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, কিংবা চিন্তিত হয়ো না, বরং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ করে আনন্দিত হও।" ৪১:৩০।

"আমরা পার্থিব জীবনে তোমাদের সহায়ক বন্ধু আছি এবং পরকালেও (থাকব)। সেখানে তোমাদের মন যা কিছু চাইবে তাই মজুদ রয়েছে এবং সেখানে তোমরা যা কিছু ফরমায়েশ করবে তাই তোমাদের জন্য (হাযির) থাকবে।" ৪১:৩১।

৪.২। আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস :

ঈমানের অন্যতম রুকন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করার নির্দেশ এসেছে এবং যারা তাতে বিশ্বাস করে না তাদের ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার সাধারণ প্রকাশ এই যে, মু'মিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের নিকট ওহীর মাধ্যমে 'কিতাব' প্রেরণ করেছেন, যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য হেদায়াত ও মানব জাতির পথ নির্দেশক। তবে পূর্ববর্তী যুগের কিতাবগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ্ সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন' নাযিল করেছেন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলির স্থান পূরণ করতে এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করতে। এই সর্বশেষ কিতাব কুরআনেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানবজাতির মুক্তির পথ রয়েছে। আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহে ঈমানের বিস্তারিত দিকগুলি নিম্নরূপ:

৪.২.১। আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন :

যুগেযুগে নবী-রাসূলগণের কাছে আল্লাহ্ তাঁর বাণী গ্রন্থ আকারে প্রেরণ করেছেন ও মঙ্গলের নির্দেশনা দান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"সকল মানুষই ছিল একই উম্মাহ্‌ভূক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল বিষয়ে বিধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন।" সূরা বাকারা- ২:২১৩।

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ কতিপয় নবীর নাম উল্লেখ করে তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

"তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌তে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণের উপরে যা

অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা দেয়া হয়েছে, সব কিছুর উপরে বিশ্বাস আনয়ন করেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।" সূরা বাকারা- ২:১৩৬। আরো দেখুন : ৩:৮৪, ৮৭:১৮-১৯, ৫৩:৩৬-৩৭।

৪.২.২। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও সেগুলির অবস্থা :

আমরা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অধিকাংশের নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। আমরা কেবল মানব জাতির হেদায়েতের জন্য গ্রন্থ নাযিলের ধারায় বিশ্বাস করি।

আল্লাহ্ তিনটি প্রসিদ্ধ কিতাব তিনজন নবীকে দান করেছেন বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। মূসা (আ.)-কে তাওরাত, দাউদ (আ.)-কে যাবুর এবং ঈসা (আ.)-কে ইঞ্জিল গ্রন্থ প্রদান করেন। এই গ্রন্থগুলির প্রচলিত ইংরাজী নাম যথাক্রমে (Old Testament (Torah), Psalms (Zaboor) ও New Testament (Bible)। পূর্ববর্তী এই কিতাবগুলি তাদের অনুসারীগণ বিকৃত করে ফেলেছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেরিত মূল অবস্থায় সেগুলি নেই। আহলে কিতাবীরা তাদের গ্রন্থসমূহ সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত গোপন করা, ভুলে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করে বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আয়াত- ২:৭৫, ২:৭৯, ৫:১৩-১৫, ৫:৪১, ৩:৭৮-৭৯ দ্রঃ।

বাস্তবেও দেখা যায় ইহুদীদের কাছে প্রাপ্ত তাওরাতের সাথে খৃষ্টানদের পুরাতন টেষ্টামেন্টের মিল নেই, আবার ইঞ্জিল কিতাবেরই চার ব্যক্তির লিখিত চারটি পুস্তক আছে, যেগুলির আবার শত শত ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ পাওয়া যায়।

৪.২.৩। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সম্পর্কে মুসলিমগণের বিশ্বাস :

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মূল তাওরাত, যাবুর, ও ইঞ্জিলের বহুলাংশ ইহুদী ও খৃষ্টানরা বিভিন্নভাবে বিকৃত করেছে অথবা বিলুপ্ত করেছে। আবার কিছু পুস্তক তারা নিজেরা লিখে ওহী বলে চালিয়েছে। তবে অন্যান্য গ্রন্থের মত তা একেবারে হারিয়ে যায় নি। (যেমন ইবরাহীম আ. এর 'সহীফা'-এর কথা কুরআনে উল্লেখ আছে, কিন্তু তার কোন রকম অস্তিত্ব নেই)। আহলে কিতাবীদের এই সব গ্রন্থে আল্লাহ্‌র বাণী ও মানবীয় বিকৃতি সংমিশ্রিত অবস্থায় আছে, যদিও বিকৃতির পরিমাণই বেশী। এই গ্রন্থগুলির কোন্ কথাগুলি সঠিক ওহী এবং কোন্‌গুলি বিকৃতি এর সত্যাসত্য যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে আল-কুরআন, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের নিয়ন্ত্রক, পর্যবেক্ষক ও পরীক্ষক। (সুরা মায়েদা- ৫:৪৮ দ্রঃ)।

সুতরাং এ সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কোন তথ্য যদি কুরআনের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আর যে তথ্য কুরআনের সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তা আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। আর কুরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে, তবে আমরা সে বিষয়ে নীরব থাকি; কারণ তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। যেহেতু একজন সাধারণ মুসলমানের পক্ষে ঐ সব গ্রন্থের সকল পাঠ্য কুরআনের আলোকে বিচার করা সম্ভব নাও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) শিখানো মূল নীতি হচ্ছে, এ সকল পুস্তকের সব কিছু সঠিক বা মিথ্যা বলে ঘোষণা দেয়া যাবে না, বরং বলতে হবে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা সঠিক।

৪.২.৪। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ :

মানব জাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে আহ্বানের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব আল-কুরআন, যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেন। এই মহান গ্রন্থ মানব জাতির সকল মঙ্গল ও সকল সফলতার উৎস। কুরআনকে আল্লাহ্ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্বের গ্রন্থগুলিকে দেন নি।

৪.২.৪.১। অলৌকিকত্ব :

কুরআনুল কারীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অলৌকিকত্ব। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ্ অনেক মু'জিযা দান করেছিলেন যেগুলি ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন। তাঁদের সমসাময়িক মানুষেরা সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তবে পরবর্তী মানুষেরা আর তা প্রত্যক্ষ করে নি, কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে আল্লাহ্ অন্যান্য অগণিত মু'জিযার পাশাপাশি চিরন্তন মু'জিযা হিসাবে আল-কুরআন প্রদান করেন। কুরআনের অলৌকিকত্ব যেমন তাঁর সমকালীন মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পারছেন।

বস্তুত কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নূতন নূতন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানব দেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, কুরআনে এসব বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ।

কুরআনুল কারীমের অলৌকিকত্বের অন্যতম একটি হচ্ছে এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী ও অর্থ, যা ভাষার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সাহিত্যমাণ রক্ষা করেছে। আরবের তৎকালীন অবিশ্বাসীরা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় অত্যন্ত পারঙ্গম ছিল, তারা আবার বলত নিরক্ষর মুহাম্মাদ (সা.) নিজে কুরআন রচনা করেছেন। এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে কুরআনের একাধিক আয়াতে কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ (১৭:৮৮) বা মাত্র একটি সূরা

(২:২৩-২৪, ১০:৩৮) কিংবা দশটি সূরা (১১:১৩) লিখে আনতে আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু তারা বা আজ পর্যন্ত কোন অবিশ্বাসীই এর মোকাবেলায় কোন কিছু উপস্থাপন করতে পারে নি।

৪.২.৪.২। কুরআনের সংরক্ষণ :

কুরআনের দ্বিতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক এর সংরক্ষণ। মহান আল্লাহ্ কুরআনকে অবিকল ও আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> "নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চিতরূপেই আমি তার সংরক্ষক।" সূরা হিজর- ১৫:৯।

যেহেতু কুরআন কিয়ামাত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাই আল্লাহ্ নিজে এর সকল প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কোন অংশের বিকৃতি বা বিলুপ্তি থেকে তা সংরক্ষণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী যুগের কিতাবগুলির বেলায় হয় নি।

কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক এই যে, মহান আল্লাহ্ একে মুসলিম উম্মাহ্র সকলের জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এবং রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন পাঠ ও কুরআন 'খতম' করা মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব।

কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম আরেকটি দিক এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী। এই অপূর্ব ভাষাশৈলী ও অপার্থিব অর্থ-আবহ যে কোন মুসলিমকে তা পাঠ করতে আগ্রহী করে তোলে। সর্বোপরি অলৌকিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পরিপূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা অলৌকিকভাবে সহজ করেছেন। আমরা জানি যে, নিজের মাতৃভাষায় রচিত ১০০ পৃষ্টার একটি সাহিত্যকর্ম হুবহু আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখা যে কোন মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব বিষয়। অথচ ১০/১২ বৎসর বয়সের একজন অনারব কিশোরও কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখতে সক্ষম। এ কারণে কুরআন যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল সেভাবেই সাহাবীগণ ও পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা তা মুখস্থ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মুখস্থ করার পাশাপাশি কুরআন কারীম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পরবর্তী প্রজন্মের কোন মানুষ কর্তৃক কুরআনের সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতির কোন সুযোগই ছিল না। কুরআনের অবিকৃতির সত্যতা সকল অমুসলিম গবেষকরাও মেনে নিয়েছেন।

৪.২.৪.৩। সর্বজনীনতা :

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ঈমান ও আমলের বিষয়গুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনগোষ্টির বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে, আর জাগতিক বিষয়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও তাদের উপযোগী সমাধানই দেয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে কুরআন কারীমের নির্দেশনা স্থান-কাল ভেদে সমগ্র মানবজতির জন্য এসেছে। কুরআনে ঈমান ও আমলের বিষয়গুলির বর্ণনায় এক পরিপূর্ণ স্পষ্টতার অনুসরণ করা হয়েছে এবং জাগতিক বিষয়গুলি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন সকল যুগের সকল সমাজের মানুষেরা এর অনুসরণ করতে পারে, আবার বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের চাহিদা, মূল্যবোধ ও নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসেন (কুফ্র ও অজ্ঞতার) অন্ধকার থেকে (ইমান ও জ্ঞানের) আলোর দিকে; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।" সূরা ইবরাহীম-১৪:১। অনুরূপ আয়াত- ২:১৮৫, ৫৪:১৭, ২২, ৩২ ও ৪০।

তাই কুরআনই আমাদের মুক্তির একমাত্র দিশারী। এর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবনের সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও ইহ-পরকালের সাফল্য। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "এটি এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন ও চিন্তাগবেষণা করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।" সূরা সা'দ- ৩৮:২৯। অনুরূপ আয়াত- ১০:৫৭, ৬:১৫৫, ১৭:৯, ৪৭:২৪, ৬৪:৮, ৭:১৫৭।

৪.৩। আখিরাতে বিশ্বাস :

৪.৩.১। আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব :

কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআনে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা 'আখিরাত' বা 'শেষ দিবসে' ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত যে দুটি বিষয়কে কুরআনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদাতের একত্ব এবং আখিরাতে বিশ্বাস। কুরআনুল কারীমে এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট, যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোন না কোন বর্ণনা নেই। কারণ সাধারণভাবে আল্লাহ্য় বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্খলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ হচ্ছে শিরকে নিপতিত হওয়া এবং আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। পরকাল বা আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো মৃত্যুর পর কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ্ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, কবরের পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামাতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহ্র মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাউয, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত, শাফা'আত,

জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামাত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহ্‌র দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন।

৪.৩.২। কবরের প্রশ্ন : বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার রূহ তাকে ফেরৎ দেয়া হবে এবং তাকে 'মুনকার ও নাকীর' নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দ্বীন ও তার নবী সম্পর্কে। মু'মিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

কবরের শাস্তি : পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্নভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরআউনের সম্প্রদায়কে। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় (জাহান্নামের) আগুনের সামনে, এবং যে দিন কিয়ামাত ঘটবে সে দিন (বলা হবে) ফিরআউনের সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে।" সূরা মু'মিন- ৪০:৪৫-৪৬। আরো দেখুন- ১৪:২৭, ৬:৯৩, ২৩:৯৯-১০০।

অপর পক্ষে সৎকর্মশীল মু'মিনগণ কবরে অবস্থান কালে শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন।

সাধারণভাবে মৃত্যু পরবর্তী এ অবস্থাকে 'কবরের অবস্থা' বলা হলেও 'কবর' বলতে মৃত্যু ও কিয়ামাতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো হয়, যার অপর নাম 'আলমে বারযাখ' বা আড়ালের জগত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন কারণে কবরস্থ না হলেও সে এই জগতের বা অবস্থার শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে।

৪.৩.৩। কিয়ামাতের আলামত বা পূর্বাভাস :

কিয়ামাত বা মহা প্রলয় ও পুনরুত্থান অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। এ সম্পর্কে কুরআনে বারংবার বলা হয়েছে। যেমন এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন,

> "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত কখন ঘটবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন . . . .।" সূরা আ'রাফ- ৭:১৮৭। আরো দেখুন ২৭:৬৫, ৭৯:৪২-৪৫ ইত্যাদি।

তবে কুরআনে ও হাদীসে কিয়ামাত আসন্ন হওয়ার লক্ষণসমূহ সম্পর্কে জানানো হয়েছে যেগুলিকে 'ক্ষুদ্রতর' ও 'বৃহত্তর' এই দুই ধরনের আলামত হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রতর বা সাধারণ আলামত : এর অন্যতমটি হচ্ছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমন। হাদীসে আছে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী একত্রিত

করে বলেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামাতের সাথে এরূপ পাশাপাশি।" বুখারী- ৪.১৮৮১, ৫.২০৩১, ২৩৮৫ ও মুসলিম- ৫৯২, ২২৬৮, ২২৬৯।

হাদীস থেকে আরো জানা যায় কিয়ামাতের পূর্বে আরব উপদ্বীপে নদ-নদী প্রবাহিত হবে, ক্ষেতখামার ছড়িয়ে পড়বে। ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে সম্পদ প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হবে। তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ ও অনাচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভণ্ড নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল আলামত প্রকাশের এ পর্যায়ে বিশেষ বা বৃহত্তর আলাতমগুলি প্রকাশিত হবে।

বৃহত্তর আলামত : এ সম্পর্কে বহু হাদীস আছে যার অন্যতম একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "দশটি নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামাত হবে না। ১. পূর্ব দিকে ভূমি ধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ২. পশ্চিম দিকে ভূমি ধ্বস, ৩. আরব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বস, ৪. ধুম্র, ৫. দাজ্জালের আবির্ভাব, ৬. ভূমির প্রাণীর আবির্ভাব, ৭. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, ৮. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ৯. এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেয়া এবং ১০. ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ।" মুসলিম- ২২২৫-২২২৬।
এসব আলামতের কোন কোনটির কথা কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ভূমির প্রাণী সম্পর্কে ২৭:৮২, ইয়াজুজ-মাজুজের বিষয়ে ২১:৯৬-৯৭ আয়াতে উল্লেখ আছে।

৪.৩.৪। ধ্বংস, পুনরুত্থান ও হাশর :
কুরআন হাদীসে অগণিত স্থানে সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস, মানব ও অন্যান্য প্রাণীর পুনরুত্থান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন,

> "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার, (তখন) পৃথিবী পর্বতমালা সমেত উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। সে দিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ন হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।" সূরা হাক্কা- ৬৯:১৩-১৬। আরো দেখুন ১৪:৪৮-৪৯, ১৯:৮৫-৮৬ ইত্যাদি।
>
> "এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা দণ্ডয়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" সূরা যুমার- ৩৯:৬৮।

৪.৩.৫। হিসাব ও প্রতিফল :
ইহকালের কর্মের হিসাব ও কর্মফল দানের ব্যাপারে কুরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেন,

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব (আমল নামা) যা সে পাবে উম্মুক্ত। 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।" সূরা বানী ইসরাঈল- ১৭:১৩-১৪। আরো দেখুন- ২৪:২৫, ১৯:৮৫-৮৬, ৮৪:৬-১৫, ৯৯:১-৮।

৪.৩.৬। মীযান, সিরাত, হাউয :

মীযান : হিসাবের একটি বিশেষ দিক যে, মহান আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মীযান বা তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"এবং কিয়ামাতের দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের পাল্লা বা তুলাদণ্ড। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" সূরা আম্বিয়া- ২১:৪৭। অনুরূপ আয়াত- ৭:৮-৯, ১০১:৬-১১।

সিরাত : আখিরাতের বিশ্বাসে সিরাত বলতে জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল, সেতু বা রাস্তাকে বুঝানো হয়। সকল মানুষকেই সেই রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। সকল পুণ্যবান ব্যক্তি নিজ নিজ আমল অনুযায়ী আনুপাতিকভাবে বিভিন্ন গতিতে তা সহজেই পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছাবেন, জাহান্নামীরা তা অতিক্রম করতে পারবে না, সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে এবং কুরআনের সূরা মারইয়াম এর ৭১-৭২ আয়াতেও এর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

হাউয : মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে এক পবিত্র হাউয বা জলাশয় দান করেছেন যেখান থেকে তাঁর উম্মাহ্ কিয়ামাতের দিন পানি পান করবে। এই পানি বরফের চেয়েও বেশী শুভ্র এবং মধু মিশ্রিত দুধের চেয়েও মিষ্ট। এর পরিধি ফিলিস্তিন থেকে ইয়েমেনের দুরত্বের সমান এবং এতে পানপাত্রগুলির সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চাইতে বেশী। হাউযের এসব বর্ণনা বহু বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে। এ সকল হাদীসের মধ্যে এও আছে, মুসলিম উম্মাহর বিদ'আতী লোকদেরকে সেখানে ভিড়তে দেয়া হবে না। (দেখুন বুখারী- ৫.২৪০৫, ২৪০৬ মুসলিম- ৪.১৮০০, ১.২১৭-২১৮, ৪.১৭৯৮-১৭৯৯, ১৭৯৩-১৭৯৫, ১.৩০০।

৪.৩.৭। শাফা'আত :

শাফা'আত অর্থ সুপারিশ করা বা কারো আব্দারকে সমর্থন করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ কিয়ামাতের দিন কারো পাপ বা অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি না দেয়ার জন্য আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা। ইহজগতে যে কোন মধ্যস্থতাকারী অপর একজনের কাছে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে বটে। কিন্তু পরকালে সুপারিশের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র; সে দিন তিনি ছাড়া কোন সুপারিশকারী থাকবে না। অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে তিনি আল্লাহ্র কাছে কারো জন্য সরাসরি সুপারিশ

করার উম্মুক্ত ক্ষমতা, অনুমতি বা অধিকার রাখেন এবং এভাবে সুপারিশ করে কাউকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারেন। বরং যিনি আল্লাহ্‌র কাছে শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন তিনি যদি ঈমানদার হোন এবং শাফা'আত করার জন্য মহান আল্লাহ্‌র অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে অনুমতি দেন তবেই তিনি শাফা'আত করবেন। উপরন্তু যার জন্য শাফা'আত করবেন তার প্রতি যদি মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ শাফা'আত করার সুযোগ বা অনুমতি প্রদান করবেন। যার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন (বিশেষত কাফির, মুশরিক) তার জন্য কেউ শাফা'আত করবে না এবং তার জন্য শাফা'আতের অনুমতিও মিলবে না। সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

আরবের মুশরিকরা মনে করত ফিরিশতারা শাফা'আতের ক্ষমতা প্রাপ্ত, অন্যান্য পৌত্তলিকরাও তাদের মূর্তির প্রতি এমন ধারণা পোষণ করে। খৃষ্টানরা মনে করে তাদের নবী এবং ওলীগণও শাফা'আতের ক্ষমতা প্রাপ্ত, যেমন কিছু বিভ্রান্ত মুসলিমও মনে করে তাদের পীরগণ শাফা'আত করবেন, এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন, নিজের কর্মফল যাই হোক না কেন। অপর দিকে বিভ্রান্ত কিছু মুসলিম ফিরকা, যেমন খারিজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি নবীগণের শাফা'আতকে অস্বীকার করে। কারণ তারা কুরআনের কিছু আয়াতকে নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে। কারো শাফা'আত করার ক্ষমতা থাকার দাবী বা তাতে বিশ্বাস করা স্পষ্ট শির্‌ক্ কেননা এটা আল্লাহ্‌র অধিকারে অংশীদার হওয়ার দাবীর নামান্তর।

কুরআনে শাফা'আত :

মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।" সূরা বাকারা- ২:৪৮। (অনুরূপ আয়াত- ২:১২৩, ২৫৪, ৬:৫১,৭০, ১০:১৮, ৩২:৪০, ৩৬:২৩, ৩৯:৪৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> "কে সে যে তাঁর (আল্লাহ্‌র) অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট শাফা'আত করবে?" সূরা বাকারা- ২:২৫৫।
>
> "দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে আসবে না।" সূরা তাহা- ২০:১০৯।
>
> "আকাশে কত ফিরিশতা রয়েছে! (মানুষের জন্য) তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।" সূরা নাজম- ৫৩:২৫। (অনুরূপ আয়াত- ১০:৩, ১৯:৮৭, ৩৪:২৩, ২১:২৮।)

উপরের আয়াত থেকে এটাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে ফিরিশতাগণও শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন।

হাদীসে শাফা'আত :
অগণিত হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীগণ ও অন্যান্য মানুষ এবং মানুষের আমল শাফা'আত করবে এবং তাদের শাফা'আত কবুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. শাফা'আতে উযমা বা মহোত্তম শাফা'আত। এর অর্থ কিয়ামাতের দিন একমাত্র মুহাম্মাদ (সা.) সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শাফা'আত করবেন যেন তিনি মানুষদের বিচার শুরু ও শেষ করে দেন। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ মানব জাতির এ অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হবেন না।
২. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) শাফা'আতে অনেক পাপী মুসলিম ক্ষমা প্রাপ্ত হবে।
৩. আরো অনেক পাপী মুসলিম জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
৪. উম্মাতে মুহাম্মাদীর অনেক পুণ্যবান মানুষ শাফা'আত করবেন।
৫. সন্তানগণ পিতামাতার জন্য শাফা'আত করবে।
৬. কুরআন তার তিলাওয়াতকারী ও অনুসরণকারীর জন্য সুপারিশ করবে।
৭. সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদাত শাফা'আত করবে ও তা কবুল করা হবে।

শাফা'আত সম্পর্কিত এই বিষয়গুলিতে বিশ্বাস আমাদের আকীদার অংশ।

৪.৩.৮। জান্নাত ও জাহান্নাম :
জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষের চুড়ান্ত ঠিকানা ও গন্তব্যস্থল। জান্নাত চিরস্থায়ী নিরাপত্তা, সুখ, আনন্দ উপভোগ ও শান্তির আবাস এবং জাহান্নাম চিরস্তায়ী শাস্তি, কষ্ট ও গ্লানির আবাস। কুরআনে এমন পৃষ্টা কমই আছে যেখানে পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ নেই। হাদীসেও অসংখ্য বর্ণনা এসেছে জান্নাত ও জাহান্নামের। এখানে কুরআনের দুটি আয়াত উদ্বৃত করা হলো। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"মুত্তাকীরা থাকবে (জান্নাতের) নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখী হয়ে বসবে। এইরূপ ঘটবে; এবং তাদেরকে সঙ্গিনী দেব আয়তলোচনা হুর, সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমুল আনতে বলবে। (পৃথিবীতে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মুত্যু আস্বাদন করবে না। তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। এই তো মহা সাফল্য।" সূরা দুখান- ৪৪:৫১-৫৭।

জাহান্নামীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

"আপ্যায়নের জন্য এ-ই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ? যালীমদের (কাফির, মুসরিক ও জঘন্য পাপী) জন্য আমি তা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এ বৃক্ষ উদ্গাত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা, তারা তা হতে ভক্ষণ করবে, এবং এর দ্বারা তারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি তাদের জন্য আছে ফুটন্ত পানির মিশ্রন।" সূরা সাফফাত- ৩৭:৬২-৬৭।

অন্যত্র অনেক আয়াতে ও হাদীসে আছে, জাহান্নামীরা আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে এবং যতবার তাদের চামড়া ও মাংস পুড়ে যাবে ততবার তা আবার নূতন চামড়া ও মাংস দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে, তাদের শাস্তি লাঘব হবে না এবং তাদের মৃত্যুও হবে না। পাপ অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

৪.৩.৯। পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন :

জান্নাতে মহান আল্লাহ্‌র দর্শনই হবে মু'মিনগণের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম নিয়ামাত। কুরআন কারীমে ও অগণিত হাদীসে বারংবার এ নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" সূরা কিয়ামাহ্- ৭৫:২২-২৩।

অনেকগুলি 'মুতাওয়াতীর' (বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত) পর্যায়ের হাদীসের একটি হাদীসে আছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন,

"আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি কিয়ামাতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখবো? তিনি বলেন, আকাশ পরিস্কার থাকলে সূর্য বা চন্দ্র দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? আমরা বললাম : না। তিনি বললেন : সেদিন তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হবে না, ঠিক যেমন চন্দ্র ও সূর্য দেখতে অসুবিধা হয় না।" বুখারী- ৬.২৭০৬, মুসলিম- ১.১৬৭ (অনুরূপ হাদীস- বুখারী- ১.২০৩, ২০৯, ২৭৭, ৪.১৬৭১, ১৮৩৬, মুসলিম- ১.১৬৩-১৬৭, ৪৩৯ ইত্যাদি)।

আখিরাতে আল্লাহ্‌র দর্শনের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেন, "আখিরাতে মহান আল্লাহ্ পরিদৃষ্ট হবেন। জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে মুসলিমগণ তাঁকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের চর্মচক্ষুর দ্বারা। এই দর্শন (আমাদের বোধগম্য) সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে।" (আল ফিকহুল আকবার)

ইহজগতে মানুষ চর্মচক্ষুর দ্বারা আল্লাহ্‌কে দেখার ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন : "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত . . .।" সূরা আন'আম- ৬:১০৩। আরো দেখুন- ৪২:৫১, ৭:১৪৩।

কিছু বিভ্রান্ত ও বিলুপ্ত ফিরকা (মুতাজিলা, খারিজী ইত্যাদি) কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার দ্বারা আখিরাতে আল্লাহ্‌র দর্শনকে অস্বীকার করে।

৪.৪। তাক্‌দীরে বিশ্বাস :

৪.৪.১। তাক্‌দীরে বিশ্বাসের অর্থ

'কাদ্‌র' ও 'কাদার' শব্দ মূলত পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায়। তাক্‌দীর অর্থ পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ধারণ করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'ইমান বিল কাদার' অর্থ আল্লাহ্‌র অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান, তাঁর ইচ্ছা, এবং তাঁর নির্ধারণ বা তাক্‌দীরে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ্ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কর্মপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাক্‌দীর বা আল্লাহ্‌র নির্ধারণ বলা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিশ্বের ভাল, মন্দ, আনন্দ ও কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে ঘটে। তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। সব কিছুই আল্লাহ্ নির্ধারিত 'পরিমাপ' বা 'কাদার'-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "আমি প্রত্যেক জিনিষ সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" সূরা কামার-৫৪:৪৯। অনুরূপ আয়াত-১৩:৮, ১৫:২১।

৪.৪.২। তাক্‌দীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি : তাক্‌দীরে বিশ্বাসের অর্থ নিম্নের পাঁচটি বিষয়ে বিশ্বাস করা।

৪.৪.২.১। আল্লাহ্‌র অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস :

সকল মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সাথে কোন সৃষ্টির জ্ঞানের তুলনা হয় না। সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন পরিবর্তন নেই।

৪.৪.২.২। আল্লাহ্‌র লিখনে বিশ্বাস :

ইসলামী বিশ্বাসের অংশ হলো যে, আল্লাহ্ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান 'লওহে মাহফুযে' (সংরক্ষিত পত্রে) বা 'কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাবে) লিখে রেখেছেন। লিখনের প্রকৃতি আমরা জানি না। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

> "অদৃশ্যের কুঞ্জী তাঁরই (আল্লাহ্‌র) নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও নেই অথবা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" সূরা আন'আম-৬:৫৯।

অন্যত্র আল্লাহ্ ঘোষণা করেন,

> "ভূপৃষ্টে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।" সূরা হুদ- ১১:৬।

তিনি আরো বলেন,

"পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপরে যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লিপিবদ্ধ) থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে এ খুবই সহজ।" সূরা হাদীদ- ৫৭:২২। অনুরূপ আয়াত দ্রঃ-১০:৬১, ১৩:৩৮-৩৯, ২২:৭০, ২৭:৭৫, ৩৪:৩, ৩৫:১১।

৪.৪.২.৩। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিশ্বাস :

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহাবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও তাঁর জ্ঞানে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোন ঘটনা ঘটে না। কুরআন কারীমে বার বার তা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।" সূরা ইনসান (দাহর)- ৭৬:৩০-৩১। অনুরূপ- ৮১:২৭-২৯।

(মানুষের ভাল ও মন্দ কাজ উভয়ই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়, তবে আল্লাহ্ মন্দ কাজ পছন্দ করেন না।) - সংকলক

৪.৪.২.৪। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিশ্বাস :

সকল মু'মিন বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর সব কিছুই সৃষ্ট। মানুষের কর্মও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"এই তো আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" সূরা আন-আম- ৬:১০২।

"এবং আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা।" সূরা সাফ্‌ফাত- ৩৭:৯৬। অনুরূপ আয়াত- ১৩:১৬।

৪.৪.২.৫। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস :

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের উপরই ইসলামের বিধিবিধানের ভিত্তি। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় যে কর্ম করে সে শুধু তারই পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মু'মিন বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে আল্লাহ্ বিবেক, বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে। তবে তার কর্ম আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ্ বার বার জানিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে তার ফল ভোগ করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" সূরা দাহর- ৭৬:২-৩। অনুরূপ- ৯০:৮-১০, ৯১:৮-১০।

তাক্দীরে বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা উভয় বিশেষণে সমানভাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ বা তাক্দীরে অবিশ্বাস করলে আল্লাহ্র জ্ঞান ও ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা হয়। আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাস করলে আল্লাহ্র ন্যায়পরায়নতা ও করুণায় অবিশ্বাস করা হয়। এ অবিশ্বাসের শুরু মহান আল্লাহ্র বিশেষণ ও কর্মকে মানুষের গুণাগুণ বা কর্মের মত বলে বিশ্বাস করা থেকে। আল্লাহ্র সকল বিশেষণ সমানভাবে প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করলে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকে না।

সম্ভবত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝা যাবে। আল্লাহ্র নির্ধারণ হলো যে বিষ মৃত্যু আনে। মানুষকে আল্লাহ্ বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন যে, বিষ গ্রহণ মৃত্যু ঘটাবে। এর পরও কেউ বিষ পান করলে সে মৃত্যুবরণ করবে। তবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুসারে ঘটবে। আল্লাহ্ তাঁর অনন্ত জ্ঞানে জানেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বা না জেনে বিষ পান করবে। তিনি তাঁর এ জ্ঞান 'কিতাব মুবীন' বা 'লওহে মাহফুযে' লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি হরণ করে তাকে বিষ থেকে বিরত রাখতে পারেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে বিষপানকারীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ্র জ্ঞান, লিখনি বা তাক্দীর নির্ধারণ অনুসারে বিষপানকারীর মৃত্যু আসবে অথবা আসবে না। আর বিষপানকারী তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও কর্ম (নিয়্যাত) অনুযায়ী কর্মফল লাভ করবে।

৪.৪.৩। তাক্দীরের বিশ্বাসের বিকৃতি :

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবী বিষয়ে বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর শিক্ষাকে আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস না করে যুক্তি, তর্ক, ব্যক্তিগত অভিমত, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির আলোকে বিচার, গ্রহণ, সংযোজন ইত্যাদি করা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ।

মক্কার কাফিরগণ তাক্দীর বিষয়ে এরূপ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "মুশরিকরা বলে, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা (কেহই) তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতাম না এবং তাঁর নির্দেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষেধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করত। রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।" সূরা নাহ্ল- ১৬:৩৫। অনুরূপ আয়াত ৬:১৪৮-১৪৯।

এখানে কাফিরদের বিকৃতির বিষয়টি লক্ষণীয়। তারা বলেছে, "আল্লাহ্ চাইলে আমরা এরূপ করতাম না।" এ কথা দ্বারা তারা বুঝাচ্ছে যে, 'আমরা যে শির্ক্ করছি তা আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। অতএব এটা বুঝা যায় যে, তিনি চান বলেই আমরা শির্ক্ করছি, এতে বুঝা যায় যে তিনি এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন।' অথচ মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমাদের এ দাবীর স্বপক্ষে কোন 'ইলম' বা ওহীর জ্ঞান থাকলে তা পেশ কর' (সূরা আনআম- ৬:১৪৮-১৪৯)।

অর্থাৎ তাদের এ সকল দাবী মনগড়া যুক্তি ও আল্লাহ্র নামে মিথ্যা অভিযোগ। কেননা আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি শির্ক্ অপছন্দ করেন, কিন্তু কাফিররা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অপব্যবহার করে কুফ্রী করছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন, কিন্তু তাদের অবাধ্যতার কারণে তারা সে দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৪.৪.৪। ইসলামী তাক্দীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা :

ইসলামী তাক্দীরে বিশ্বাস ও অনৈসলামিক ভাগ্যে বিশ্বাসকে অনেক সময় এক করে ফেলা হয়। অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন কর্মের কি দরকার। আমরা দেখেছি যে এসব চিন্তা ওহীর বিকৃতি ও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক 'ধারণা' মাত্র, মক্কার কাফিরদের ধারণার মতই একটি বিকৃত ধারণা।

যে অবিশ্বাসী লোক তাক্দীর নিয়ে বিতর্ক ও বিবাদ করে, তাক্দীরের দোহাই দিয়ে কর্ম ছেড়ে দেয় সে মূলত নিজেকে আল্লাহ্র কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে। সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়, আমার কাজ হলো আল্লাহ্র কাজের বিচার করা।

আর মু'মিনের বিশ্বাস, আল্লাহ্র কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয়। তিনি কি জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছে দেন আর রেখে দেন কিছুই মানুষকে জানান নি। কারণ এ সব জানা মানুষের কোন কল্যাণে আসবে না। এসব কিছুই তাঁর রুবুবিয়্যাতের অংশ। মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহ্র রহমত ও করুণার উপর আস্থা রেখে আল্লাহ্র নির্দেশমত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা মনে স্থান না দেয়া। ইসলামের তাক্দীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমুখী করে তোলে, কখনই কর্ম বিমুখ করে না।

তাক্দীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতি-উল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামাত আসলে সে অহংকারী হয়ে উঠে না। সে জানে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও অনুগ্রহেই সে সফলতা লাভ করেছে। অপরদিকে ব্যর্থতা বা পরাজয় আসলে সে হতাশ হয় না। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে জানে যে, তার প্রচেষ্টা ও সৎ কর্মের

জন্য সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যদি তোমার কিছু (ব্যর্থ) হয় তবে কখনো বলবে না, যদি আমি ঐ কাজ করতাম বা সেই কাজ করতাম তা হলে হয়ত এরূপ হতো . . . , এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খোলে দেয়।" মুসলিম- ৪.২০৫২ (সার সংক্ষেপ)।

তাক্‌দীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয়। সেখানে শয়তান হতাশা বা অবসাদের বীজ বপন করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীগণের তাক্‌দীরে বিশ্বাস ছিল সবচাইতে শক্তিশালী, তাঁরা তাদের কর্মের ফলাফলের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র উপর। এর ফলে সংখ্যায় নগণ্য হয়েও তাঁরা বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছেন। সাহাবীগণের তাক্‌দীরে বিশ্বাস তাঁদের সকল ভয়, সংশয়, দুচিন্তা দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি-১ : কুফ্‌র ও নিফাক

অবিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস বা ঈমানের বিপরীতার্থক শব্দ। ঈমানের যেহেতু বিভিন্ন রুকন বা মৌলিক শাখা এবং তদ্‌সঙ্গে বিবিধ প্রশাখা বা বিষয় রয়েছে, সেহেতু অবিশ্বাসও সামগ্রিক বা আংশিক হতে পারে। অর্থাৎ কোন অবিশ্বাসী ঈমানের সকল মৌলিক বিষয় অবিশ্বাস করতে পারে, আবার কেউ কিছু বিশ্বাস এবং কিছু বিষয় অবিশ্বাস করতে পারে। এই উভয় ধরনের অবিশ্বাসের বিবিধ কারণ ও প্রকার রয়েছে।

৫.১। কুফ্‌র

৫.১.১। অর্থ ও পরিচিতি :

আরবী শব্দ কুফ্‌র এর মূল অর্থ আবৃত করা বা গোপন করা এবং এর ব্যবহারিক অর্থ অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে 'কুফ্‌র' বলা হয়, কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে আবৃত বা গোপন করা।

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফ্‌র বা অবিশ্বাস। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের অন্যান্য রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় কুফ্‌র বলে গণ্য করা হয়। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার ইত্যাদি যে কোন কারণে যদি কারো মধ্যে ঈমান বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে কাফির বলা হয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফ্‌র। তবে এ পর্যায়ের কুফ্‌রকে ইসলামী পরিভাষায় শির্‌ক্ বলা হয়।

৫.১.২। কুফ্‌র এর প্রকার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফ্‌রকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় : ১. **কুফ্‌র আকবার বা বৃহত্তর কুফ্‌র** ও ২. **কুফ্‌র আসগার বা ক্ষুদ্রতর কুফ্‌র**। কুফ্‌র আকবার বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বুঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে। এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ। আর কুফ্‌র আসগার বলতে বুঝানো হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, তবে এরূপ পাপে লিপ্ত মানুষকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির বলে গণ্য করা হয় না।

তাদেরকে অনন্ত জাহান্নামী বলেও বিশ্বাস করা হয় না। বরং তাদেরকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়।

৫.১.৩। কুফ্‌র আকবার এর প্রকারভেদ :

তাওহীদ ও আরকানুল ঈমানের আলোকে কুফ্‌র আকবার বা প্রকৃত কুফ্‌রকে নিম্নের পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

৫.১.৩.১। আল্লাহ্‌র প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস :

তাওহীদের প্রথম পর্যায় হচ্ছে তাওহীদুল রুবুবিয়্যাত বা প্রতিপালনের একত্বে বিশ্বাস। এ বিষয়ে কোন প্রকার অবিশ্বাস, অস্বীকার, দ্বিধা, সন্দেহ বা আংশিক বিশ্বাস 'কুফ্‌র আকবার' বলে গণ্য। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তাঁর স্রষ্টাত্বে অবিশ্বাস, অন্য কোন স্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস, তাঁর প্রতিপালনের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কারো বিশ্ব পরিচালনা প্রতিপালন বা মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস, তাঁর রিয্‌ক দানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কোন রিযিকদাতা আছে বলে বিশ্বাস ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্‌র। অনুরূপভাবে কিছু বিষয় আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস ও কিছু বিষয়ে তা অবিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্‌র।

৫.১.৩.২। নাম ও গুণাবলীর একত্বে অবিশ্বাস :

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর কিছু বা সব অস্বীকার করা এ পর্যায়ের কুফ্‌র। এ কুফ্‌র দুই প্রকারের : প্রথমত কুফ্‌রুন নাফ্‌ই বা অস্বীকারের কুফ্‌র - এর অর্থ আল্লাহ্‌ যে সকল নাম ও গুণ তাঁর আছে বলে জানিয়েছেন তার সব বা যে কোন একটি অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ্‌র ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (কথা), রাহমাত (অনুগ্রহ, করুণা) . . . ইত্যাদি যে কোন এক বা একাধিক নাম বা গুণ অস্বীকার করা বা তার পূর্ণতা অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌র কোন কর্ম বা গুণ তাঁর সৃষ্টির মত বা তুলনীয় বলে বিশ্বাস করাও একই পর্যায়ের কুফ্‌র বা অবিশ্বাস।

দ্বিতীয়ত কুফ্‌রুল ইস্‌বাত বা দাবীর কুফ্‌র - এর অর্থ আল্লাহ্‌ নিজের জন্য যা (নাম বা গুণ) না থাকার কথা জানিয়েছেন (তথা থাকা অস্বীকার করেছেন) তা তাঁর আছে বলে দাবী করা। যেমন আল্লাহ্‌র ঘুম, তন্দ্রা, সন্তান, স্ত্রী . . . ইত্যাদি দাবী করা।

আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের জন্য যে সকল গুণ, বিশেষণ ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি নিজের জন্য বা অন্য কোন সৃষ্টির জন্য সে সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক গুণ বা বিশেষণ দাবী করে তবে তাও এ প্রকারের কুফ্‌রী বলে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ্‌র মত ইলম, হিকমাত, রাহমাত . . . ইত্যাদি অন্য কারো আছে বলে দাবী করা। এরকম দাবী স্বীকার বা বিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্‌র।

৫.১.৩.৩। ইবাদাতের একত্বে অবিশ্বাস :

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে তাওহীদুল উলূহিয়্যাত বা তাওহীদুল ইবাদাত। অর্থাৎ মা'বুদ হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ্‌র, তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই। সকল নবী-রাসূল ইবাদাতের তাওহীদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তাদের ইবাদাত বর্জন কর।

আল্লাহ্‌র ইবাদাতের একত্ব অস্বীকার করা, তাঁর একমাত্র মা'বুদ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস পোষণ করা বা অন্য কেউ কোনরূপ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আছে বলে বিশ্বাস করা এ পর্যায়ের কুফ্‌র। আমরা দেখেছি যে যুগে যুগে অধিকাংশ কাফিরই এ প্রকারের কুফ্‌রে লিপ্ত হয়েছে।

৫.১.৩.৪। রিসালাতে অবিশ্বাস :

ইতোপূর্বে রিসালাতে বিশ্বাস-এর অধ্যায়ে সাধারণভাবে সকল নবী-রাসূলগণের উপর এবং বিশেষত শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর বিশ্বাসের যতগুলি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিতে বা তার যে কোন একটিতে অবিশ্বাস করা রিসালাতে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করার সমতুল্য। যেমন আল্লাহ্‌র প্রেরিত যে কোন একজন নবীকে অস্বীকার করা সকল নবী-রাসূলকে অস্বীকার করার মত কুফ্‌র। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ (সা.) এর রিসালাতের বিশ্বাসের বিষয়গুলি যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, মহত্ব, রিসালাত, নুবুওয়াতের পূর্ণতা, প্রচার ও তাবলীগের পূর্ণতা, নুবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, স্থায়িত্ব, সমাপ্তি, মুক্তির একমাত্র পথ ইত্যাদি কোন বিষয়ে অস্বীকার, অবিশ্বাস বা সন্দেহ তাঁর রিসালাতে অবিশ্বাসের কুফ্‌র। মুহাম্মাদ (সা.) যা কিছু বলেছেন তার কোন বিষয়কে মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত বলে মনে করাও একই পর্যায়ের কুফ্‌র।

মুহাম্মাদ (সা.) এর নুবুওয়াতের বিশ্বাসের অর্থই হলো তিনি যা বলেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা বিশুদ্ধ হাদীস হিসাবে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত তা সবই সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি বলেছেন বা করেছেন বলে প্রমাণিত কোন সংবাদ, শিক্ষা, কথা, বক্তব্য বা কাজকে অসত্য বলে মনে করা বা সন্দেহ করা কুফ্‌রী। কুরআন অথবা সুন্নাহ্ দ্বারা, বিশেষত মুতাওয়াতিরভাবে (বহু সাহাবী থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রাপ্ত হাদীস) প্রমাণিত কোন বিধান অস্বীকার করাও একই পর্যায়ের কুফ্‌রী। সালাত, যাকাত, সিয়াম, ইত্যাদি ফরয হওয়া অস্বীকার করা ; সুদ, ব্যাভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অস্বীকার করা; সালাতের সময়, তাহারাত, রুকু, সাজদা ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার বা ব্যতিক্রম করা ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্‌র। তবে অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করলে তা ওজর বলে গণ্য হতে পারে।

৫.১.৩.৫। সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফ্‌র :
কোন প্রকার কুফ্‌রে সন্তুষ্ট থাকা কুফ্‌র। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাও কুফ্‌র। এ প্রকারের মধ্যে রয়েছে :

ক. আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করা, বা আল্লাহ্‌র যিক্‌র, কুরআন, ইসলাম বা ইসলামের বিধান বলে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোন কিছুর প্রতি বিরক্তি বা ঘৃণা পোষণ করা, অথবা ইসলামের কোন নির্দেশ বা শিক্ষা অচল, সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "যারা কুফ্‌রী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি (আল্লাহ্) তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিস্ফল করে দিবেন।" সূরা মুহাম্মাদ- ৪৭:৮-৯।

খ. ইসলামের কোন প্রমাণিত বিষয় নিয়ে হাসি তামাসা, মস্করা বা উপহাস করা, অথবা যারা এরূপ করে তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।" সূরা আন'আম- ৬:৬৮।

গ. কাফিরদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করা বা তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা। মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের, যারা সুস্পষ্টভাবে ঈমানের কোন রুকন বা কুরআন-হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বিষয় অস্বীকার করেছে, আপত্তিকর বলে বিশ্বাস করেছে বা উপহাস করেছে, যাদের কুফ্‌র সন্দেহাতীতভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত এবং যাদের কুফ্‌র-এর বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন তাদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করা, কাফির বলে গণ্য না করা, তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ বা দ্বিধা করা। অথবা এরূপ কাফিরগণকে আন্তরিক বন্ধু সহযোগী ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা। (তবে তাদের সাথে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রাখা ও মানবীয় সহযোগিতা নিষিদ্ধ নয়)। কুরআনে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "মু'মিনগণ যেন মু'মিন ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরকম করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।" সূরা আলে-ইমরান- ৩:২৮। অনুরূপ আয়াত- ৪:১৩৮-১৪০, ১৪৪, ৫:৫১, ৫৭, ৯:২৩, ৫৮:২২।

ঘ. ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুসরণ করে কেউ মুক্তি লাভ করতে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে বা আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন।" সূরা আলে-ইমরান- ৩:১৯।
>
> "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।" সূরা আলে-ইমরান- ৩:৮৫।

৫.১.৪। কুফ্‌র আকবার এর বিভিন্ন প্রকাশ :

উপরে কুফ্‌র আকবার এর প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে। কুফ্‌র আকবার মানুষের মধ্যে বিবিধভাবে প্রকাশ পায়। কুরআনের আলোকে এর নিম্নরূপ প্রকাশ রয়েছে :

৫.১.৪.১। ওহীকে মিথ্যা মনে করার কুফ্‌র (কুফ্‌র তাকযীব) :

ওহীর নির্দেশনাকে মিথ্যা বলে মনে করা যুগে যুগে কুফ্‌র বা অবিশ্বাসের প্রধান প্রকাশ। নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মাধ্যমে, অথবা আসমানী কিতাব পাঠের মাধ্যমে অথবা অন্যান্য প্রচারকদের মাধ্যমে মানুষের কাছে যখন ওহীর শিক্ষা উপস্থিত হয় তখন এরূপ অবিশ্বাসীরা ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সমন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?" সূরা আনকাবূত- ২৯:৬৮।

৫.১.৪.২। অহঙ্কারের কুফ্‌র (কুফ্‌র ইস্তিকবার) :

ঈমানের বিষয়ের সত্যকে অনুভব করার পরেও অহঙ্কার বশত তা অস্বীকার করা। অনেক অবিশ্বাসীই এরূপ কুফরে লিপ্ত হয়। এরূপ অহঙ্কারের কুফরে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয় ইবলীস। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "যখন ফিরিশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলই সিজদা করল; সে অমান্য করল এবং অহঙ্কার করল, সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হলো।" সূরা বাকারা- ২:৩৪।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ ফিরাউন ও অন্যান্য কাফিরদের বিষয়ে বলেন,

> "তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। অতএব দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!" সূরা নামল- ২৭:১৪।

৫.১.৪.৩। সন্দেহের অবিশ্বাস (কুফ্‌র শাক্ক) :

ঈমানের কোন বিষয়ে হৃদয়ে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকাকে সন্দেহের কুফ্‌র বলা হয়। ঈমানের অর্থ সন্দেহাতীত প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা। কাজেই কোন বিষয়ে যদি মনে কিছু বিশ্বাস ও কিছু সন্দেহ থাকে বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বদলে অস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে তাকে কুফ্‌র বলে

গণ্য করা হয়। যেমন কেউ বলল, 'আমার মনে হয় না যে কিয়ামাত সংঘটিত হবে' তবে এটা সন্দেহের কুফ্‌র। (সূরা কাহাফ- ১৮:৩৫-৩৮ দ্রষ্টব্য)।

৫.১.৪.৪। অবজ্ঞার কুফ্‌র (কুফ্‌র ই'রায) :

দ্বীন ও ঈমানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ না করে নির্লিপ্ত থাকা বা ঈমানের বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করাকে অবজ্ঞার কুফ্‌র বলা হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "যারা কাফির তারা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে বে-খেয়াল বা মুখ ফিরিয়ে থাকে।" সূরা আকাফ- ৪৬:৩।

৫.২। মুনাফিকীর কুফ্‌র (কুফ্‌র নিফাক) :

অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের দাবী করাকে কুফ্‌রু নিফাক বলে। নিফাক বা মুনাফিকী হচ্ছে কুফ্‌র এর একটি বিশেষ দিক যা কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশ্বাসের মুনাফিকী ছাড়াও কর্মের মুনাফিকীর একটি পর্যায় রয়েছে।

নিফাক-এর পরিচিতি ও প্রকার ভেদ

আরবীতে 'নিফাক' শব্দের অর্থ কপটতা (hypocrisy)। শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা ইত্যাদি। নিফাকে লিপ্ত মানুষকে মুনাফিক বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দুই প্রকার : ১. বিশ্বাসের নিফাক ও ২. কর্মের নিফাক।

৫.২.১। বিশ্বাসের নিফাক (নিফাক আল-ই'তিকাদী) :

অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিফাক বলা হয়। এরূপ নিফাকের স্বরূপ হচ্ছে : ১. রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) সকল শিক্ষা বা দা'ওআত বা তাঁর শিক্ষার কোন দিককে মিথ্যা বলে মনে করা, ২. তাঁকে ঘৃণা করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, ৩. তাঁর কোন শিক্ষাকে ঘৃণা করা, ৪. তাঁর দ্বীনের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া অথবা দ্বীনের বিজয়ে দুঃখিত হওয়া, ৫. তাঁর দ্বীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা। মূলত কুরআন-হাদীসে এরূপ নিফাকের কথাই বলা হয়েছে। এরূপ নিফাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবী করে। এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফ্‌রী করেছে ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" সূরা মুনাফিকুন- ৬৩:৩।

মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে, বিশেষত রাসূল (সা.) ও মুসলিমদের সাথে তাদের শত্রুতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও মিথ্যাচারিতার বিষয়ে এবং পরকালে তাদের

শাস্তির ব্যাপারে।" (আরো দেখুন আয়াত ২:৮-২:১৬, ৪:১৩৮-৪:১৪৬, ৯:৬৭ - ৯:৬৮, ৬৩:১-৬৩:৮)

৫.২.২। কর্মের নিফাক (নিফাক আল-আমলী) :

মানুষের বাহ্যিক কর্মে তার অন্তরের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু মুখে বিশ্বাসের দাবী করে, স্বভাবতই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, যেগুলি প্রমাণ করে যে প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত। এ জাতীয় কিছু কর্ম বা আমলের বর্ণনা হাদীসে এসেছে। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> "চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোন একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে ঃ ১. যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, ২. যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে, ৩. যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং ৪. যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে। বুখারী- ১.২১, ৩.১১৬০, মুসলিম- ১.৭৮।

এ সকল কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে তা হলে এ সকল কর্ম যথার্থ কুফ্র বা বিশ্বাসের নিফাক বলে গণ্য হবে না, বরং কুফ্র আসগারের ন্যায় নিফাক আমলী বা কর্মের নিফাক বলে গণ্য হবে।

৫.৩। কুফ্র আসগার বা ক্ষদ্রতর অবিশ্বাস

কুফ্র মূলত হৃদয়ের অবিশ্বাসের নাম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের নাম নয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে যে সকল 'পাপকর্ম'কে কুফ্র বলা হয়েছে কিন্তু যেগুলির সাথে হৃদয়ের অবিশ্বাস জড়িত নয় সেগুলিকে 'কুফ্র আসগার' (ক্ষুদ্রতর কুফ্র) বা 'কুফ্র নি'মাহ' অর্থাৎ নিয়ামাতের অস্বীকার বা রূপকার্থে কুফ্র বলে অভিহিত করা হয়। কুরআনে অবিশ্বাসের পাশাপাশি অকৃতজ্ঞতাকেও কুফ্র বলা হয়েছে (দ্রঃ সূরা নাহ্ল- ১৬:১১২)।

এ ছাড়া আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে পাপ ও অবাধ্যতার সহ-অবস্থান না হওয়াই ঈমানের দাবী। বস্তুত বিশ্বাসের ঘাটতি ছাড়া কেউ পাপে লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর সিফাতসমূহের প্রতি, আখিরাতের প্রতি ও আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস পরিপূর্ণ থাকলে কেউ পাপে লিপ্ত হতে পারে না। এজন্য পাপে লিপ্ত হওয়া বিশ্বাসের ঘাটতি বা অপূর্ণতা নির্দেশ করে। তবে যতক্ষণ এরূপ অপূর্ণতা পূর্ণ অবিশ্বাসে পরিণত না হয় ততক্ষণ একে কুফ্র আসগার বলে অভিহিত করা হয়।

কুরআন ও হাদীসে অনেক কঠিন পাপকে কুফ্‌র বলে অভিহিত করা হয়েছে, আবার এ সকল কুফ্‌রীতে লিপ্ত মানুষদেরকে মু'মিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বিদায় হজ্জে রাসূল (সা.) বলেন, "তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না যে একে অপরকে হত্যা করবে।" বুখারী- ১.৫৬, ২.৬১৯, ৬২০ ইত্যাদি এবং মুসলিম- ১.৮১-৮২ (একাধিক সনদে)।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> "মুসলিমকে গালি দেয়া পাপ, এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।" বুখারী- ১.২৭, ৫.২২৪৭, ৬.২৫৯২, মুসলিম- ১.৮১।

আবার কুরআনে একটি আয়াতে যুদ্ধরত মানুষদেরকে মু'মিন বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "মু'মিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালংঙ্ঘন করলে তোমরা যুলুমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে . . . ।" সূরা হুজুরাত- ৪৯:৯-১০।

এ সকল হাদীস ও আয়াতের সমন্বয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ সকল অপরাধ কুফ্‌র আসগার বা ক্ষুদ্রতর কুফ্‌র বলে গণ্য। এগুলি কঠিন পাপ, তবে যদি কেউ এগুলিকে পাপ ও নিষিদ্ধ জেনে, নিজেকে অপরাধী বলে বিশ্বাস করে শয়তানের প্ররোচনায় বা জাগতিক কোন স্বার্থে এরূপ পাপে লিপ্ত হয় তবে সে পাপী মু'মিন বলে গণ্য হবে, ইসলাম ত্যাগকারী বা পারিভাষিক কাফির বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ এরূপ কর্ম বৈধ মনে করে, অথবা আল্লাহ্‌কে মান্য করা ঐচ্ছিক মনে করে, বা আল্লাহ্‌র এ সকল নির্দেশ বা যে কোন নির্দেশ মান্য করা তার নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বা কোন যুগের জন্য অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে অথবা অন্য কোন ধর্মের বা সমাজের বিধান অধিকতর উপযোগী বলে মনে করে তবে তা হবে কুফরে আকবার এবং সে ধর্মত্যাগী ও কাফির বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> " আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" সূরা মায়িদা- ৫:৪৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি-২ : শির্ক্

৬.১। অর্থ ও পরিচিতি

আরবীতে শির্ক্ শব্দের অর্থ শরীক বা অংশীদার হওয়া। সাধারণভাবে এ দ্বারা অংশীদার করা বা সহযোগী বানানো অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র কোন বিষয়ে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা, বা আল্লাহ্র প্রাপ্য কোন ইবাদাত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শির্ক্ বলা হয়। এক কথায় আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে অন্য কাউকে অংশী বানানোই শির্ক্।

কুরআনের ভাষায় শির্ক্ হলো কাউকে 'আল্লাহ্র সমতুল্য' করা। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানাবে না।" সূরা বাকারা-২:২২।

হাদীসে আছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্র নিকট সব চেয়ে কঠিন পাপ কি? তিনি বলেন, সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহ্র সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" বুখারী-৪.১৬২৬, ৫.২২৩৬ ইত্যাদি; মুসলিম-১.৯০,৯১।

কাউকে মহান আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাত, আসমা, সিফাত বা ইলাহিয়্যাত এর ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য মনে করা, অথবা আল্লাহ্কে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহ্র জন্য যে ইবাদাত করা হয় তা অন্য কাউকে প্রদান করাই শির্ক্।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য :

প্রথমত, কুফ্র ও শির্ক্ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাউকে কোনভাবে কোন বিষয়ে মহান আল্লাহ্র সমকক্ষ বা তুলনীয় মনে করার অর্থই তাঁর একত্বে অবিশ্বাস বা কুফ্রী করা। আল্লাহ্র তাওহীদ ও রাসূলগণের দা'ওয়াতে অবিশ্বাস না করে কেউ শির্ক্ করতে পারে না। কাজেই শিরকের অর্থই তাওহীদ ও রিসালাতে অস্বীকার করা। অপরদিকে কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ না মেনে ঈমানের কোন রুকন অবিশ্বাস করলে তা শুধু কুফ্র বলে গণ্য। যেমন কেউ আল্লাহ্ অস্তিত্বে বা তাঁর প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস করেন বা মুহাম্মাদ (সা.) এর রিসালাত, খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি অস্বীকার করেন তবে তা কুফ্র হলেও

বাহ্যত তা শির্ক্ নয় কারণ এরূপ ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাউকে আল্লাহ্র সাথে তুলনীয় বলে দাবী করছেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফ্রের সাথেও শির্ক্ জড়িত। কারণ এরূপ ব্যক্তি কোন না কোনভাবে এ ক্ষয়িষ্ণু জড় বিশ্বকে মহান আল্লাহ্র মত অনাদি-অনন্ত বলে বিশ্বাস করছে, বিশ্ব পরিচালনায় প্রকৃতি বা অন্য কোন শক্তিকে বিশ্বাস করছে।

দ্বিতীয়ত, কুফ্র বা অবিশ্বাসের অন্যতম প্রকাশ হচ্ছে শির্ক্। সাধারণভাবে যুগেযুগে অবিশ্বাসীগণ মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বে, তার গুণাবলী, বা তাঁর মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফ্রী করে নি, বরং এগুলিতে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করেই কুফ্রী করেছে। এজন্য কুরআন ও হাদীসে কুফরের বর্ণনায় শির্কের কথাই বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ কল্পনা করা বা শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারি যে, দু'ভাবে শির্ক্ হয়ে থাকে : ১. মহান আল্লাহ্র কোন সৃষ্টির প্রতি অতি-সুধারণা, অথবা ২. মহান আল্লাহ্র প্রতি কু-ধারণা বা অব-ধারণা।

শির্কে নিপতিত মানুষেরা কখনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, নেককার মানুষ, কারামত প্রাপ্ত মানুষ, তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, কখনো সূর্য, চন্দ্র, আগুন, পাহাড় ইত্যাদি কোন সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তি ও মর্যাদা প্রদানে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে 'অলৌকিক শক্তি' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা কল্পনা করেছে। অথবা মহান আল্লাহ্র পূর্ণতার গুণের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাঁকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেছে এবং তাঁর সন্তান, পরিষদ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কল্পনা করেছে।

কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত শির্ক্ এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শির্ক্ পর্যালোচনা করলে আমরা মূলত এ দুটি বিষয়ই দেখতে পাই। এবং এ দুটি বিষয়ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারো প্রতি ভক্তির অতিরঞ্জনের অর্থই আল্লাহ্র ক্ষমতা, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা।

৬.১.১। শির্ক্ এর হাকীকত (প্রকৃতি)

আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ক্ষমতায় ও সৃষ্টিতে বা সকল দিক থেকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা যেমন শির্ক্, তেমনি মহান আল্লাহ্ কাউকে নিজের শরীক বানিয়ে নিয়েছেন, বা কাউকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা, ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করাও শির্ক্। তবে সাধারণভাবে কোন মুশরিকই কাউকে সকল দিক থেকে বা স্বকীয়ভাবে আল্লাহ্র সমতুল্য বলে শির্ক্ করেনি, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের শির্ক্ই সর্বদা ব্যাপক।

আরবের মুশরিকরাও বিশ্বাস করত, আল্লাহ্‌র কিছু বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে সাধারণ বান্দাদের চাইতে মর্যাদায় ঊর্ধ্বে উঠেন, যাদেরকে আল্লাহ্ খুশী হয়ে নিজের কর্মে ও ক্ষমতায় শরীক করেছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্ট লাভের জন্য ও এদের শাফা'আত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তারা এদের ইবাদাত করত। আর ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতায় কিছু বান্দাকে এভাবে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বা সমতুল্য বিশ্বাস করাকেই কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌র সমতুল্য নির্ধারণ করা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ (র.) বলেন : "শির্‌কের হাকীকত এই যে, কোন মানুষ কোন কোন সম্মানিত মানুষের ক্ষেত্রে ধারণা করবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যে সব অলৌকিক কার্য সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় তা উক্ত ব্যক্তির পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে। এ সকল অলৌকিক কার্য প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এমন কিছু বিশেষ গুণ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। এরূপ গুণ মূলত আল্লাহ্‌রই আছে। আল্লাহ্ যাকে উলুহিয়্যাত বা এরূপ বিশেষত্ব প্রদান করেন, অথবা আল্লাহ্ যে ব্যক্তির সত্তার সাথে সংমিশ্রিত হন, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার মধ্যে 'ফানা' বা বিলুপ্তি লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে 'বাকা' বা অস্তিত্ব লাভ করে, বা অনুরূপ কোনভাবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ এরূপ ক্ষমতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন তিনিই কেবল তা প্রাপ্ত হন। এভাবে মানুষের উলুহিয়্যাত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা গুণ লাভের পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে অনেক ভিত্তিহীন কুসংস্কার বিদ্যমান। এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আরবের কাফিরগণ হজ্জের 'তালবিয়ার' মধ্যে ও কাবাঘর তাওয়াফের সময় বলত,

> "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, . . . আপনার কোন শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে ছাড়া। এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপানারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন . . . ।" মুসলিম- ২.৮৪৩।

". . . মুশরিকরা ধারণা করত যে, জাগতিক রাজারা যে রকম কিছু নিকটবর্তী লোককে ছোট খাটো দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালনের জন্য নিয়োগ দেন এবং বিশ্বস্তদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, তেমনি মহাবিশ্বের রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌ও তাঁর কিছু নৈকট্ট প্রাপ্ত বান্দাকে ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতা প্রদান করেন এবং এদের বিরক্তি ও সন্তুষ্টিকে তার অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রভাবময় করে দিয়েছেন। এজন্য মুশরিকরা মনে করত যে এসব নৈকট্ট প্রাপ্ত বান্দার নৈকট্ট লাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট তাদের কবুলিয়তের ওসীলা হতে পারে। আর পরকালে হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা'আত মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য তাদের মন বলে যে, এ সকল নৈকট্ট প্রাপ্ত বান্দাদের সামনে সিজদা কর, তাদের জন্য জবাই-উৎসর্গ কর, তাদের নামে কসম কর, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে ত্রাণ ও সাহায্য প্রার্থনা কর; পাথরে, তামায়, পিতলে বা অন্য কিছুতে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি এঁকে রাখ, এদের

এ সকল প্রতিকৃতি সামনে রেখে এদের রূহের প্রতি মনোনিবেশ কর। ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রজন্মগুলির মানুষেরা মূর্খতার কারণে এদের এ সকল মূর্তি ও প্রতিকৃতিই প্রকৃত ইলাহ বা মা'বুদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে।" (শাহ ওয়ালিউল্লাহ্, আল-ফাওযুল কাবীর পৃ ২৪-২৫)

৬.১.২। তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ

কুরআন কারীমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শির্ক্ বিষয়ক আলোচনা। হাদীসেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহ্র আলিমগণও শির্ক্-কুফ্র নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শির্কের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা শির্ক্কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। শির্কের ভয়াবহতা, তাওহীদের বৈপরিত্য ও শির্কী কর্মের ভিত্তিতে এ সকল ভাগ করা হয়েছে। শিরকের ভয়াবহতা অনুযায়ী শির্ক্কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; ১. শির্ক্ আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শির্ক্ বা প্রকৃত শির্ক্ ২. শির্ক্ আসগার বা ক্ষুদ্রতর শির্ক্। সকল শির্ক্ কর্মকে প্রধান এই দুইভাগের অন্তর্গত করা যায়।

৬.২। শির্ক্ আকবার

তাওহীদের বিপরীতই হচ্ছে শির্ক্ তথা শির্ক্ আকবার। তাই তাওহীদের তিনটি পর্যায়ের মত শির্ক্ আকবারকেও তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় : প্রতিপালনের শির্ক্, ইবাদাতের শির্ক্ এবং নাম ও গুণাবলীর শির্ক্। নীচে এই তিন ধরনের শির্ক্ ও শির্কী কর্মসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। উল্লেখ্য, তাওহীদের বিপরীত বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং শির্ক্ কর্মে লিপ্তরা প্রকৃত মুশরিক, সে যে কোন ধর্মের লোক হিসাবে নিজের পরিচয় দিক না কেন।

৬.২.১। প্রতিপালনের শির্ক্ :

প্রতিপালনের শির্ক্ (রুবুবিয়্যাতের শির্ক্) এর অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিয্ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। অধিকন্তু মহান আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাতের কোন বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শির্ক্, কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীরা প্রকৃতি বা অন্য কোন জাগতিক শক্তিকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতা সম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে। নিম্নলিখিত কর্মসমূহে প্রতিপালনের শির্ক্ প্রকাশ পায় :

ক. প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতার শির্ক্ :

যারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে প্রকৃতি বা যুগের আবর্তনে জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটে তারা বাস্তবে প্রকৃতিকেই মহান আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাতের গুণধারী বলে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস কুফ্রী এবং শির্ক্ও। যেমন আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহ্কে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করত। কিন্তু তাদের অনেকেই আখিরাতে বিশ্বাস করত না। তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষ যুগের আবর্তনে মরে শেষ হয়ে যায়, মাটিতে মিশে গেলে আবার

পুনরুত্থিত হওয়ার সম্বাবনা নেই। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এদের বিভ্রান্তি আলোচনা ও অপনোদন করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তারা বলে 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে।' বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে।" সূরা জাসিয়াহ- ৪৫:২৪ আয়াত।

খ. আল্লাহ্র সাথে আত্মীয়তার দাবীর শির্ক্ :

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যাদেরকে 'আল্লাহ্র বিশেষ বান্দা' বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহ্র কন্যা বা আল্লাহ্র পুত্র বলে আখ্যায়িত করত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত বলে দাবী করত। যেমন আরব মুশরিকগণ ফিরিতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা, কিছু ইহুদী উযাইর (আ.) কে আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃষ্টানরা ঈসা (আ.) কে আল্লাহ্র পুত্র বলে বিশ্বাস করত। সাধারণত সন্তানত্ব দ্বারা তারা একটি বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতো যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। এগুলি সবই মহান আল্লাহ্র মর্যাদার পরিপূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক শির্কী বিশ্বাস। কুরআন কারীমে বার বার এগুলির বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরূপ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়েছে।

গ. আল্লাহ্র ইলমুল গাইবে শির্ক্ :

মুশরিকদের শির্ক্ এর অন্যতম একটি প্রকাশ ছিল মহান আল্লাহ্ ছাড়াও অন্য কারো কারো 'ইলমুল গাইব' অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

এখানে লক্ষণীয় যে মহান আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাতের অন্যতম দিক তাঁর অনন্ত অসীম, অতুলণীয় ও সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। তাঁর অন্যতম সিফাত হলো 'আলিমূল গাইব' বা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী এবং 'আলিমুল গাইব ওয়াশ শাহাদাহ্' বা 'অদৃশ্য ও দৃশ্যমান (সকল) জ্ঞানের অধিকারী'। কুরআন কারীমে একথা বলা হয় নি যে মহান আল্লাহ্র মত গাইবী জ্ঞান কারো নেই, বরং বারংবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞানই আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে গাইবের জ্ঞান তাঁর নবী-রাসূলদের প্রদান করেন। এ ছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলসহ সমগ্র সৃষ্টিকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

বান্দার জ্ঞান উপকরণের অধীন। জাগতিক বা আত্মিক উপকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি, ওহী ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দা জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য জাগতিক উপকরণ সকল মানুষের জন্য সমান। আর ওহী, ইলম ইত্যাদি মহান আল্লাহ্ দয়া ও পছন্দ করে কোন বান্দাকে দিতে পারেন। এগুলি একান্তই মহান আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন, বান্দার ইচ্ছাধীন নয়।

ইলমুল গাইবে শির্ক্ করার বিভিন্ন দিক রয়েছে :

১. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো (উপকরণ ছাড়া) কোন বিশেষ বা সকল গাইবের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

২. ওহী বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া কোন ব্যক্তি কোনভাবে কোন গাইব অথবা অতীত, বর্তমান বা ভাবিষ্যতের অদৃশ্য কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা। জোতিষী, গণক, যাদুকর ও জ্বীনদের বিষয়ে আরবের মুশরিকগণ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত।

৩. আল্লাহ্র সকল ইলমুল গাইব তিনি তাঁর কোন বান্দাকে জানিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা। এতে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা অস্বীকার করা হয়। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টির সকল জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য এবং আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের সময়, আগামীকাল মানুষ কি করবে, কোথায় মরবে ইত্যাদি কিছু বিষয় মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। এজন্য কাউকে আল্লাহ্ এরূপ সকল ও সামগ্রিক গাইব জানিয়েছেন বলে দাবী করাও কুরআনের নির্দেশনা অস্বীকার করা বলে গণ্য। খৃষ্টানগণ ঈসা (আ.) এর বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। এমন কি একদল মুসলিমও (যেমন বেরেলভীরা) এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে যে মুহাম্মাদ (সা.)-কেও আল্লাহ্ সকল ইলমুল গাইব শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

৬.২.২. ইবাদাতের শির্ক্ :

ইবাদাত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। ইবাদাতের ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহ্কে অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ইবাদাত করাকে ইবাদাতের শির্ক্ বলা হয়। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদাতের শির্কেই বেশী লিপ্ত হয়েছে।

মানুষ বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে পড়লে আল্লাহ্র কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকুতি জানায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের মুর্খতা, দুর্বলতা ও অস্তিরচিত্ততা অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না। কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার বিপদ বা সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এ রকম মানুষ মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত 'দৃশ্যমান' বা হাতের নাগালে পাওয়া যায় এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। গাইরুল্লাহ্র ইবাদাতের বিভিন্ন রূপ হচ্ছে :

ক. গাইরুল্লাহ্‌কে ডাকা বা গাইরুল্লাহ্‌র কাছে ত্রাণ প্রর্থনা করার (দু'আ করার) শির্‌ক্ :
দু'আ অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা। ডাকা এবং প্রার্থনা করা পরস্পর জড়িত। কারো কাছে প্রার্থনা করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং সাধারণত কাউকে ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা করা।

প্রার্থনা করা বা ডাকার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকারের হচ্ছে লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেক জনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন কারো কাছে টাকা পয়সা চাওয়া, খাদ্যদ্রব্য সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি অগণিত ধরণের বিষয়।

দ্বিতীয় প্রকার ডাকা বা প্রার্থনা অলৌকিক বা অপার্থিব। অর্থাৎ জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ জাতীয় সাহায্য করার ক্ষমতা যার আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করে তার কাছেই মানুষ প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকারের এই ডাকা বা প্রার্থনাই ইবাদাতের সর্বজনীন প্রকাশ। আর এক্ষেত্রেই মানুষ সবচেয়ে বেশী শির্‌কে লিপ্ত হয়। অলৌকিক সাহায্য আল্লাহ্ ছাড়া কারো করার ক্ষমতা নেই, অথচ মুশরিকরা অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা, পাপীর পাপের মার্জনা ইত্যাদির জন্য গাইরুল্লাহ্ তথা মুর্তি বা দেব-দেবীর কাছে আবেদন করে। তাদের কাছে উৎসর্গ-মানত করে, এই আশায় যে, তাদের বিপদাপদ কেটে যাবে বা তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

কুরআনে এই দু'আ বা ডাকার ইবাদাতের কথা সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকতে বা একমাত্র তাঁরই কাছে দু'আ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে, আর কোথাও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,
"দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদাত।" এ কথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত (সূরা গাফির ৪০:৬০) পাঠ করলেন :

> "তোমাদের প্রভু বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব)। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত থেকে অহঙ্কার করে (অবিশ্বাস বশত আমার কাছে প্রার্থনা করে না) তারা শীগ্রই লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" - তিরমিযী-৫.২১১, আবু দাউদ-২.৭৬, ইবনু মাযাহ-২.১২৫৮, সহীহ)।

মহান আল্লাহ্ ঈমানদারগণকে নির্দেশ দিলেন যে তারা সালাতের মধ্যে পড়বে, "আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" সূরা ফাতিহা- ১:৪।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, "সুতরাং আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" সূরা জিন্ন- ৭২:১৮।

লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রেও শির্ক্ হবে যদি কেউ মৃত বা অনুপস্থিত কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকেন বা তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কেননা এতে এই বিশ্বাস করা হয় যে অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা সদা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত। তাই তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কটিয়ে দেবার মত অলৌকিক ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকিকত্ব, ঐশ্বরিক শক্তি বা মহান আল্লাহ্র গুণাবলী আরোপ করে শির্কে নিপতিত হয়েছে।

এ প্রার্থনাকারী ঐ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা কল্পনা করছে তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত। অথচ এই প্রার্থনাকারী বিশ্বাস করে যে এই ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহ্র আছে তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে, অর্থাৎ সে আল্লাহ্র ঐ একক ক্ষমতায় একজন শরীক। এমন কি তার ধারণা, সম্ভবত কল্পনার মানুষটির ক্ষমতা আল্লাহ্র ক্ষমতার চেয়ে বেশী দ্রুত কার্যকর, যে কারণে আল্লাহ্কে না ডেকে সে তাকে ডেকেছে। এ ক্ষেত্রে মুশরিকদের দাবী হচ্ছে, এ সকল খাজা বাবা, পীর, সাঁই বাবা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জ্বীনদেরকে আল্লাহ্ নিজেই কিছু বা সকল ক্ষমতা দিয়েছেন।

অবশ্য বিপদে পড়ে কেউ অনির্দিষ্টভাবে যদি এমন লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করে যে, 'কে আছ, আমাকে একটু সাহায্য কর,' তবে তা বিধিসম্মত।

খ. গাইরুল্লাহ্র সিজদা করার শির্ক্ :

সিজদা করা ইবাদাতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। চূড়ান্ত ভক্তি বা অলৌকিক ভক্তির প্রকাশ হিসাবেই শুধু সিজদা করা হয়। দু'আ বা ডাকার উদ্দেশ্যেও সিজদা করা হয়। যাকে ডাকা হচ্ছে তিনি যেন খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া দেন সেই জন্য সিজদা। এ জন্য মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "এবং এই যে, সিজদা করার কর্মগুলি বা সিজদার স্থানসমূহ আল্লাহ্রই জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।" সূরা জিন্ন- ৭২:১৮।

মুশরিকগণ চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা ইত্যাদি নিজ নিজ উপাস্যকে সিজদার মাধ্যমে ইবাদাত করে। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহ্কে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা (প্রকৃতই) তাঁরই ইবাদাত কর।" সূরা ফুস্সিলাত- ৪১:৩৭।

আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন:

"সাজদাই হলো মূল; কারণ সাজদা কেবলমাত্র ইবাদত হিসাবেই শরীয়তে নির্ধারিত, কিয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়া তদ্রুপ নয়, দাঁড়ানো কেবলমাত্র ইবাদত হিসাবে শরীয়তে নির্ধারিত নয়। এজন্য যদি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে, দাঁড়ানোর বিষয়টি তদ্রুপ নয়।" ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার : ১/৪৮০, ৬/৪২৬।

কুরআন থেকে জানা যায় যে, ফিরিশতাগণ আদমকে সাজদা করেন এবং ইউসুফ (আ.)-এর পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁকে সাজদা করেন।

সর্বাবস্থায় এরূপ সালাম জ্ঞাপন সাজদা বা 'প্রণাম' করা পূর্ববর্তী শরীয়তে বৈধ ছিল, তবে ইসলামে তা হারাম করা হয়েছে, যেমন ভাইবোনে বিবাহ, দুবোনকে একত্রে বিবাহ, মদপান ইত্যাদি বিষয় পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল কিন্তু ইসলামী শরীয়তে হারাম করা হয়েছে।

একটি হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) বলেন,

"তিনি সিরিয়া গমন করেন। তথায় তিনি দেখেন যে, খৃষ্টানগণ তাদের নেককার বুজুর্গগণ ও আলিমদেরকে সাজদা করে। তিনি বলেন, তোমরা কেন এরূপ কর? তারা উত্তরে বলে: এ হলো নবীগণের তাহিয়্যাহ বা সালাম। আমরা বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার আমাদের বেশি। তিনি যখন নবী (সা.)-এর নিকট প্রত্যাগমন করলেন তখন তিনি তাঁকে সাজদা করলেন। তিনি (সা.) বলেন: হে মু'আয, এ কি? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করে দেখলাম যে, খৃষ্টানগণ তাদের পাদরি, দরবেশ ও বিশপদের সাজদা করে এবং ইহুদীগণ তাদের আলিম, বুজুর্গ ও ফকীহদের সাজদা করে। আমি বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার তো আমাদের বেশি। তখন নবীউল্লাহ (সা.) বলেন, ওরা ওদের নবীগণের নামে মিথ্যা বলেছে, যেমন ওরা নবীগণের কিতাব বিকৃত করেছে। তোমরা এরূপ করো না। আমি যদি কোনো মানুষকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম।" ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৯৫।

আরো লক্ষণীয় যে, তাহিয়্যাহ বা শিষ্টাচারের সাজদার অস্তিত্ব মূলত ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুসলিম সমাজে ইবাদত হিসাবে আল্লাহ্‌কে সাজদা করা ছাড়া অন্য কোনোরূপ সাজদার প্রচলন থাকে না।

গ. গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ, জবাই, মানত করার শির্‌ক্ :

উৎসর্গ করাও ইবাদাতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। জীব জানোয়ার উৎসর্গ করা হলে আমরা সাধারণত কুরবানী দেয়া বা জবাই করা বলি। খাদ্য, ফসল, ফুল ইত্যাদি উৎসর্গ করা হলে সাধারণভাবে বাংলাদেশের মুসলিম পরিভাষায় মান্নত, সদকা ইত্যাদি বলা হয়। উৎসর্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপাস্যের বর বা আশীর্বাদ লাভ করা বা তার প্রতি অন্তরের ভক্তি প্রকাশ করা। কুরবানী বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই প্রযোজ্য। গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ বা মানত করা শির্‌ক্। এর নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "বল নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ বা কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, তাঁর কোন শরীক নেই। এ জন্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বাগ্রে (তাঁর কাছে) আত্মসমর্পণ করছি।" সূরা আন'আম- ৬:১৬২-১৬৩।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> "অতএব তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং (কেবল তাঁর জন্য) কুরবানী কর।" সূরা কাওসার- ১০৮:২।

সর্ব যুগের মুশরিকরা তাদের উপাস্য দেব-দেবী, প্রতিমা-মুর্তি বা অগ্নি, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির উদ্দেশ্যে, এসবের করুণা ও নৈকট্ট লাভের আশায়, উৎসর্গ বা জবাই করত এবং এখনো অনেকে করে। আরব মুশরিকরা তাদের উপাস্যের জন্য এবং আল্লাহ্‌র জন্যও উৎসর্গ করত। (দ্রষ্টব্য : আয়াত ৬:১৩৬, ১৬:৫৬, ৫:১০৩ ইত্যাদি)।

ঘ. গাইরুল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার শির্‌ক্ :

তাওয়াক্কুল অর্থ নির্ভরতা। নির্ভরতা লৌকিক ও অলৌকিক দুপ্রকারের হতে পারে। লৌকিক নির্ভরতা হচ্ছে স্বাভাবিক মানবীয় আস্থা, যেখানে অপার্থিবত্ব কল্পনা করা হয় না।

বিশ্বাসী মানুষ যে সত্তার মধ্যে জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অলৌকিকভাবে কল্যাণ করার বা অকল্যাণ রোধ করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তার অলৌকিক সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করে। মনের এরূপ প্রগাঢ় নির্ভরতাকেই ইসলামী পরিভাষায় তওয়াক্কুল বলা হয়। এই নির্ভরতা এক প্রকার ইবাদাত। যার উপর এই নির্ভরতা বা আস্থা নিয়ে কেউ নিজের কর্ম শুরু করেন তিনি তার উপাসক গণ্য হবেন। এজন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা, কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, কারো নামে পাড়ি জমানো ইত্যাদি সবই শির্‌ক্। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে বা তাওয়াক্কুল করতে বার বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"আর মু'মিনগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করুক।" সূরা আল-ইমরান- ৩:১২২ ও ১৬০, সূরা মায়েদা- ৫:১১, তাওবা- ৯:৫১, ইবরাহীম- ১৪:১১, ১২ এবং আরো অনেক আয়াত।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন,

"এবং (হে নবী!) আপনি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন, উকিল বা কর্ম বিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" সূরা নিসা- ৪:৮১ ও সূরা আহযাব- ৩৩:৩। অনুরূপ আরো আয়াত দেখুন- ১০:৮৪, ৫:২৩, ১৩:৩০, ১২:৬৭।

ঙ. ভয় ও আশার শির্‌ক্ :

তাওয়াক্কুল এর সাথে সম্পৃক্ত ও সমপর্যায়ের ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর অনুগ্রহের আশা করা। ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা তাওয়াক্কুলের ন্যায় দুই প্রকারের :

প্রাকৃতিক বা বৈষয়িক ও অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক। সাধারণ প্রাকৃতিক ভয় ও আশার সৃষ্টি হয় দৃনিয়ার জীবনের বিভিন্ন বস্তুগত ও বৈষয়িক কারণে। আমরা হিংস্র বা বিষাক্ত জীব, ধারাল অস্ত্র, জালিম মানুষ ইত্যাদি দেখলে ভয় পাই। পার্থিব জীবনে একে অপরের বিভিন্ন ধরনের উপকারের আশা করি। এ ধরনের পার্থিব ও বৈষয়িক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা মানুষ ও মানবেতর জীবজন্তুর মধ্যে বিরাজমান এবং তা ইবাদাতের মধ্যে গণ্য নয়। এরূপ ভয় বা আশা কোন 'বিশ্বাসের' সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং 'মানবীয় প্রকৃতির' সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ ভয় ও আশা করেন।

পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোন ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তিকে 'চূড়ান্ত বা অলৌকিকভাবে ভক্তি করে' অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলেই জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অলৌকিকভাবে উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন, তখন ঐ মানুষের মনে ঐ ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তির প্রতি ভয় ও আশার সঞ্চার হয়। এরূপ ভয় বা আশার ভিত্তি 'বিশ্বাস'। যে যাকে অলৌকিক শক্তিময় বলে বিশ্বাস করেন তাকেই এরূপ ভয় করেন বা তার অলৌকিক সাহায্যের আশা করেন, অর্থাৎ তার ইবাদাত করেন।

এই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসার ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র নিমিত্ত নির্ধারিত। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।" সূরা বাকারা- ২:৪০ এবং সূরা নাহল- ১৬:৫১।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন,

"তারা (নবী-রাসূল ও একনিষ্ঠ ঈমানদারগণ) আমাকে (আল্লাহকে) ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" সূরা আম্বিয়া- ২১:৯০।

কোন মানুষ যদি মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কোনরূপ অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা, মঙ্গল-অমঙ্গল করা বা তা রোধ করার অলৌকিক ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী মনে করত তাকে ভয় করে বা তার প্রতি সাহায্যের আশা রাখে তবে তা হবে স্পষ্ট শির্ক্। তবে জাগতিক বা পার্থিব ভয় করলে শির্ক্ হবে না।

চ. ভালবাসার শির্ক্ :

তাওয়াক্কুল, ভয় ও আশার মতই একটি ইবাদাত 'ভালবাসা'।

ভালবাসার ক্ষেত্রেও উপরে বর্ণিত জাগতিক ও ঈমানী দুটি পর্যায় আছে। জাগতিক ভালবাসা ইবাদাত নয়, তবে জাগতিক ভালবাসা যদি আল্লাহ্র বিধান পালনের বিপরীতে অবস্থান নেয় তবে তা পাপ। মানুষ তাদের পিতা-মাতা, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, উপকারী মানুষ ও অন্যান্য বিভিন্ন মানুষকে জাগতিকভাবে ভালবাসে। এরূপ ভালবাসার উৎস জাগতিক সম্পর্ক, মেলামেশা, দেখাশুনা ইত্যাদি।

ঈমানী ভালবাসার তিনটি দিক রয়েছে : (১) আল্লাহ্কে ভালবাসা, (২) আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং (৩) আল্লাহ্র সাথে ভালবাসা।

আল্লাহ্কে ভালবাসা হয় কেবলমাত্র তাঁরই জন্য, আর কারো জন্য নয়। আর এ ভালবাসার সাথে থাকে গভীর অলৌকিক ভয়, আশা, অসহায়ত্ব ও ভক্তির প্রকাশ। এরূপ ভালবাসাই ইবাদাত। আল্লাহ্র জন্য ভালবাসতে হয় যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন (সৎকর্মশীল মু'মিনগণ)।

আল্লাহ্র সাথে (অন্য কাউকে বা কিছুকে) ভালবাসা হলো শির্ক্। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র জন্য নয় বরং তার (যাকে ভালবাসা হয়) নিজের কারণে ভালবাসা বা অলৌকিক ভক্তি, ভয় ও অসহায়ত্বের সাথে ভালবাসা শির্ক্। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।" সূরা বাকারা- ২:১৬৫।

মুশরিকগণ দাবী করত যে, তারা তাদের উপাস্যদেরকে ভালবাসত 'আল্লাহ্র প্রিয়' হওয়ার কারণে এবং আল্লাহ্র নৈকট্ট লাভের আশায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে এ সকল উপাস্যদের প্রেমই ছিল মূল। এদের প্রশংসায় কিছু বললে তারা খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহ্র মর্যাদা, প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলে তারা বিরক্ত হতো। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"একমাত্র আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হয়, এবং যখন আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের (তাদের উপাস্যদের) উল্লেখ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" সূরা যুমার- ৩৯:৪৫।

ছ. আনুগত্যের শির্‌ক্ :

আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের একটি বিশেষ দিক তাঁর 'হুকুমিয়্যাত' বা হুকুম, বিধান বা ফায়সালা দানের অধিকার ও ক্ষমতা। আল্লাহ্‌র মহান নামগুলির অন্যতম হচ্ছে 'আল-হাকাম' অর্থাৎ বিচারক বা বিধান দাতা। যিনি প্রতিপালক তাঁরই অধিকার তাঁর প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্য বিধান প্রদান করার। মানুষ যেমন আপেক্ষিক অর্থে অন্যের রাব্ব বা প্রতিপালক হতে পারে, তেমনি আপেক্ষিক অর্থে বিধানদাতা, বিচারক ইত্যাদি হতে পারে। মহান আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দেশ বা অধিকারের আওতায় মানুষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র। একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ প্রতিপালক হিসাবে তিনিই জানেন সৃষ্টির কল্যাণ কিসে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌কে একমাত্র হাকাম বা বিচারক ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের অংশ। এ জন্য আনুগত্য ইবাদাতের অন্যতম প্রকাশ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"(বল, হে রাসূল সা.) তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে হুকুমদাতা মানব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।" সূরা আন'আম- ৬:১১৪।

আল্লাহ্‌র বিধানাবলী তাঁর রাসূলের (সা.) মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তিনি যে বিধান প্রদান করেন তাই আল্লাহ্‌র বিধান। কাজেই তাঁর সকল বিধান সর্বান্তকরণে মেনে নেয়াই ঈমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"কিন্তু না (হে রাসূল) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।" সূরা নিসা- ৪:৬৫।

তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ও ভালবাসার ন্যায় আনুগত্যেরও লৌকিক ও অলৌকিক দুটি পর্যায় রয়েছে। 'অলৌকিক বিশ্বাসজাত আনুগত্য' একমাত্র মহান আল্লাহ্‌রই নিমিত্ত। অন্য কাউকে এরূপ আনুগত্য করলে তা শির্‌ক্ বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"(হে ঈমানদারগণ!) যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় নি (মৃত পশু অথবা জবাইর সময়) তার কিছুই ভক্ষণ করো না। তা অবশ্যই পাপ। শয়তানরা তাদের (মানুষ্য) বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা (হারাম মাংসকে হালাল বিবেচনা করত) তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" সূরা আন'আম- ৬:১২১।

এখানে কাফিরদের আনুগত্য করাকে শির্ক্ বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তারা (ইহুদী ও খৃষ্টান) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার বিরাগীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে, এবং মারিয়ম তনয় ঈসা মসীহকেও। কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি মহা পবিত্র।" সূরা তাওবা-৯:৩১।

আহলে কিতাবীরা তাদের ধর্মগুরুদের অলৌকিক ক্ষমতা ও অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করত এবং তাদের ধর্মগ্রন্থে (তাওরাত ও ইঞ্জিল) কোন বিষয়ে কি বিধান আছে তা অগ্রাহ্য করে ধর্মগুরুদের (পোপ-পাদ্রী) দেয়া বিধানকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিত। কারণ ধর্মগুরুগণ অলৌকিক ক্ষমতার দোহাই দিয়ে ইচ্ছামত কিছু কারণ দেখিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশিত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে নিত এবং এখনও করে। তাই, ইহুদী-খৃষ্টানগণ তাদের ধর্মগুরুদের সরাসরি ইবাদাত না করলেও তাদের ঘোষিত কুফ্রী বিধান মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্য করার কারণে তাদেরকে মুশরিক বলা হচ্ছে। অর্থাৎ তারা তাদের ধর্মগুরুদেরকে এক্ষেত্রে রাব্ব বা প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে। আর রুবুবিয়্যাতে বা প্রতিপালনের শির্ক্ অবশ্যম্ভাবীরূপে ইবাদাতের শিরকে নিপতিত করে।

এখানে লক্ষণীয় যে, 'আনুগত্য' স্বাভাবিকভাবে ইবাদাত নয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের আনুগত্য অবৈধও নয়, বরং কোন ক্ষেত্রে নির্দেশিত। কুরআন-হাদীসে পিতামাতা, শাসক-প্রশাসক, আলিম-উলামা প্রমুখের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী নির্দেশের বিপরীত কোন মানুষের আনুগত্য করলে তাতে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার পাপ হবে, তবে তা শির্ক্ হিসাবে গণ্য হবে না।

পক্ষান্তরে কাউকে প্রশ্নাতীত চূড়ান্ত আনুগত্যের যোগ্য বলে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করলেই শুধু তা শির্ক্ বলে গণ্য হবে। ইহুদী-খৃষ্টানদের আনুগত্য ছিল এই পর্যায়ের। অনুরূপভাবে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূলের নির্দেশ যা-ই থাক না কেন, অমুক ব্যক্তি, পীর, আলিম, রাজা বা পার্লামেন্ট যা হালাল বলেছে তা প্রকৃত হালাল এবং যা নিষিদ্ধ করেছে তা প্রকৃতই হারাম তা হলেও তা শির্ক্ হবে। এসব ক্ষেত্রে আনুগত্য কর্মে নয়, বিশ্বাসে।

জ. হজ্জ বা যিয়ারতের শির্ক্ :

হজ্জ ইসলামের অন্যতম ইবাদাত। ইবরাহীম (আ.) এর সময় থেকে আরবের মানুষদের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কা'বা গৃহের হজ্জ আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে যখন শির্কের প্রসার ঘটে তখন কা'বা গৃহের হজ্জ ছাড়াও বিভিন্ন উপাস্যের সন্তুষ্টি, আশীর্বাদ, বর বা বরকত লাভের জন্য মুশরিকগণ আরো অনেক "পবিত্র" স্থানে

গমন করত বলে হাদীস থেকে জানা যায়। এগুলির মধ্যে ছিল ইয়ামানের 'রিয়াম' নামক মন্দির এবং খাস'আমদের 'যুল খুলাইসা' নামক মন্দির। (বুখারী-৩.১১১০, মুসলিম-৪.১৯২৫-১৯২৬)।

ইসলামী শরীয়তে এরূপ করতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

"তিনটি মসজিদ ছাড়া (যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না : মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ (মাসজিদে নববী) ও মাসজিদুল আকসা।" বুখারী-১.৩৯৮, ৪০০, ২.৬৫৯, মুসলিম- ২.১০১৪, ১০১৫। (মুশরিকদের মন্দিরসমূহে যিয়ারতে যাওয়া এবং মুসলিমদের আযমীর ও অন্যান্য মাযার যিয়ারতে যাওয়ার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই!)

ঝ. তাবার্‌রুকের শির্‌ক্ :

তাবার্‌রুক অর্থ বরকত অনুসন্ধান করা বা বরকত আশা করা। আরবের মুশরিকদের শিরকের একটি দিক ছিল তাবার্‌রুক বা বরকত লাভের জন্য কোন স্থান বা দ্রব্যের প্রতি ভক্তি প্রকাশ। তারা কা'বা ঘরের পাথর ইত্যাদি বরকতের জন্য কাছে রাখত, ভ্রমণে গেলে এগুলোকে তাওয়াফ করত বা সম্মান করত। কালক্রমে এ সকল পাথরের ইবাদাত করার প্রচলন হয়ে যায়। পরে তারা খেয়াল খুশী মত বিভিন্ন পাথর পুজা করতে শুরু করে। তাদের ভক্তিকৃত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল 'যাতু আনওয়াত' নামক একটি বৃক্ষ। হাদীসে আছে আবু ওয়াকীদ লাইসী (রা.) বলেন,

"মক্কা বিজয়ের পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি। তখন আমরা নওমুসলিম। মক্কা বিজয়ের সময়ই কেবল আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। চলার পথে তিনি মুশরিকদের একটি (বরই) গাছের নিকট দিয়ে যান, যে গাছটির নাম ছিল 'যাতু আনওয়াত'। মুশরিকগণ এ গাছের কাছে বরকতের জন্য ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। আমাদের কিছু মানুষ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দেন। তিনি (সা.) বললেন, সুবহানাল্লাহ! মূসার কাওম যে রকম বলেছিল : মুশরিকদের মূর্তির মত আমাদেরকেও মূর্তির দেবতা দাও, তোমরাও সেইরূপ বললে। যার হতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নত অনুসরণ করবে।" তিরমিযী- ৪.৪৭৫, সহীহ।

ইহুদী-খৃষ্টানদের এরূপ তাবার্‌রুক বিষয়ে যে শির্‌কের কথা হাদীসে বারংবার উল্লোখ করা হয়েছে তা হলো নবী ও ওলীগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা কবর-মাযার থেকে বরকত লাভের চেষ্টা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ বিষয়ে তাদের নিন্দা করেছেন, তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাঁর উম্মাতকে এরূপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি (সা.) বলেন,

"তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত। সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এ কাজ থেকে।"

এখানে লক্ষণীয় যে, কবর বা কবরস্থের পূজা বা মৃতের কাছে চাওয়ার জন্য নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা সালাত আদায়ের জন্য রাসূল (সা.) ইহুদী-নাসারাদেরকে কঠিন ভাষায় অভিশাপ দিয়েছেন। মসজিদে সালাত, দু'আ ইত্যাদি যা কিছু করা হয় সবই আল্লাহ্‌র জন্য, মৃতের জন্য কিছু নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র জন্য সালাত আদায়ে কবরস্থ নেককার মানুষের সাহচর্য ও বরকত লাভ। কিন্তু এরূপ তাবার্‌রুকের চিন্তাই শির্‌কের অন্যতম পথ। কেননা কালক্রমে মানুষ ঐ কবরের বা মৃতের পূজায়ই লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কঠোরভাবে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

৬.২.৩। নাম ও গুণাবলীর শির্‌ক্ :

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ্‌র পূর্ণতার গুণাবলী ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এ সকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শির্‌ক্। মহান আল্লাহ্‌কে কোনভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টিকে কোনভাবে আল্লাহ্‌র সাথে তুলনীয় মনে করা স্পষ্ট শির্‌ক্। যেমন মহান আল্লাহ্‌ই একমাত্র 'আলিমুল গাইব' তথা অদৃশ্য বা গাইবী জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণকে তাঁদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশাবলীর সাথে কিছু অদৃশ্য জ্ঞানও দান করতেন। কেবল ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে নবীগণ যে সকল গাইবী জ্ঞান জানতেন তারা তা-ই অনুসরণ ও প্রচার করতেন। এর বাইরে কোন অদৃশ্য জ্ঞান তাঁদের জানার কোন ক্ষমতা বা উপায় ছিল না। কিন্তু ৭ম-৮ম হিজরী শতকে কোন কোন আলিম একটি জাল হাদীসের উপর নির্ভর করে দাবী করতে থাকেন যে মুহাম্মাদ (সা.) সামগ্রিক ইলমুল গাইবের অধিকারী ছিলেন তথা তিনি নাকি আলিমুল গাইব ছিলেন। আমরা রুবুবিয়্যাতে শির্‌ক্ ও রিসালাতে বিশ্বাসের অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইলম বিষয়ক অনুচ্ছেদে কুরআনের অনেক আয়াত ও বহু হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র আলিমুল গাইব। আর কারো ইলমুল গাইব থাকার দাবী বা বিশ্বাস নিঃসন্দেহে শির্‌ক্। একইভাবে জ্যোতিষি, ভবিষ্যৎ বক্তা বা ভাগ্যগণনাকারী ও তাদের উপর বিশ্বাসকারী এই পর্যায়ের শিরকে লিপ্ত। আল্লাহ্‌র আরেকটি গুণবাচক নাম হচ্ছে আল-গাফুর, যার অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত ও নিঃশর্তভাবে কেবল তিনিই মানুষের পাপ ক্ষমা করার একক অধিকারী। অথচ খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে রাসূল ঈসা (আ.) আলিমুল গাইব এবং তিনি মানুষকে ক্ষমা করতে পারেন। এ ধরনের সব দাবী ও সেগুলির উপর বিশ্বাস আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে শির্‌ক্ এর অন্তর্ভূক্ত।

৬.৩। শির্ক্ আসগার :

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শির্কের মত হলেও প্রকৃত শির্ক্ (আকবার) এর পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে শির্ক্ আসগার বা ছোট শির্ক্ বলা হয়। যেমন আল্লাহ্র ইবাদাত করার ক্ষেত্রে মানুষ থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্র সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শির্ক্ হলো কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ, রুবুবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা এবং তার নিকট অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা। কিন্তু শির্ক্ আসগারের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা হয় না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। শির্ক্ আসগার-এর কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না, তবুও তা কঠিন কবীরা গুনাহ্র অন্তর্গত এবং যে কোন শির্ক্ আসগার শিরকে আকবার-এ পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপর। শির্ক্ আসগাররের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে। শির্ক্ আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

৬.৩.১। ইবাদাতে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা :

রিয়া অর্থ দেখানো বা প্রদর্শন করা। আল্লাহ্র জন্য করণীয় ইবাদাত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

মু'মিনের ইবাদাত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এ 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে ইবাদাতে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহ্র ইবাদাত বন্দেগীতে কাটালেও রিয়া বা লোকের নিকট থেকে বাহবা পাওয়ার নিয়্যাত থাকার কারণে তারা জাহান্নামী হয়ে যায়। (মুসলিম- ৩/১৫১৩)।

লক্ষণীয় যে, বান্দা যদি ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই করে, কিন্তু তৎসঙ্গে কেবল মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে। আর বান্দা যদি কেবল মানুষকে দেখানোর জন্যই ইবাদাতটি করে তবে তা শির্ক্ আকবার বলে গণ্য হবে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোকজন না দেখলেও ইবাদাতটি পালন করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলে ইবাদাতটি পালনই করবে না।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রিয়াকে 'শির্ক্ আসগার' বা 'ছোট শির্ক্' বা 'শির্ক্ খাফী' অর্থাৎ 'লুক্কায়িত শির্ক্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ বান্দা আল্লাহ্র জন্য ইবাদাত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সে কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদাত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> "আমি সব চেয়ে বেশী যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হল শিরকে আসগার বা ক্ষুদ্রতর শির্ক্। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, শির্ক্ আসগার কী? তিনি বলেন, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামাতের দিন মানুষদের যখন তাদের কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে তখন এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না।" (আহমাদ, আল সুনান- ৫/৪২৮-৪২৯)।

অন্য হাদীসে আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয়ে আমি তোমাদের জন্য বেশী ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদের বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক্। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এবং যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।" (ইবনু মাজাহ, আস সুনান- ২/১৪০৬)।

৬.৩.২। ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শির্ক্ :

মহান আল্লাহ্ এ বিশ্বের সব কিছু একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ্' বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, ঔষধে আরোগ্য হওয়া ইত্যাদি। এরূপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। তবে মু'মিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছা ও দয়া। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্ট এসব নিয়ম কানুনের কার্যকারিতা স্থগিত বা নষ্ট করে দিতে পারেন। এরূপ বিশ্বাসসহ একজন মু'মিন বলতে পারেন যে বিষের কারণে অমুকের মৃত্যু হয়েছে বা ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করেছে। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়াই বিষ মানুষ মারে, ঔষধ রোগ সারায় বা অনুরূপ কিছু ঘটে তবে তা শির্ক্ আকবার বলে গণ্য হবে।

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশেষ কোন কার্যের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যামান। যেমন কোন একটি কাজের ব্যাপারে একজন খৃষ্টান বলবে তা যীশুর ইচ্ছায় হয়েছে, একজন হিন্দু বলবে অমুক দেবী বা দেবতার কারণে ঘটেছে, একজন নক্ষত্র পুজারী বলবে অমুক রাশির কারণে ঘটেছে। দৃশ্যমান বা পরীক্ষিত জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে এরা সবাই একমত হলেও এ রকম বিশ্বাস ভিত্তিক বিষয়ে এরা কখনোই একমত নয়।

একজন মু'মিন তার বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই ওহী তথা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। এর ব্যতিক্রম করলে তা বিশ্বাসের পর্যায় অনুসারে শির্ক্ আকবার বা শির্ক্ আসগার হতে পারে।

যেমন একজন বলতে পারেন পাপের কারণে মানুষের উপর দুর্যোগ নেমে এসেছে, কিংবা যিকর-ইস্তগফারের কারণে রিযেকে বরকত এসেছে। কারণ কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত এগুলোকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একজন মু'মিন বলতে পারেন না যে অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে অথবা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের কারণে অমুক বিষয়টি ঘটেছে। কেননা এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কারণও নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও নয়। এসব রাশি প্রভাবের উপর বিশ্বাস করলে তিনি শির্ক্ আকবারে লিপ্ত হবেন।

আবার কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ্ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা শির্ক্ আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গুনাহ বলে হণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত শির্কী কথা বলেছেন এবং আল্লাহ্র নিয়ামাত অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন। উপরন্তু তা আল্লাহ্র নামে কঠিন মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে, কারণ তিনি ওহীর মাধ্যমে এরূপ কোন কার্য-কারণ জানান নি। হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন,
" . . . যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি কুফ্রী করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।" (বুখারী- ১/২৯০, ২৫০, মুসলিম- ১/৮৩, সংক্ষিপ্ত)।

৬.৩.৩। আল্লাহ্র সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা :
এপর্যায়ের শির্ক্ আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোন প্রকৃত কারণকে মহান আল্লাহ্র পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মু'মিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন, 'আল্লাহ্র ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শির্ক্ আসগার বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ও বৃষ্টিপাত দু'টিই স্বতন্ত্র কারণ, এবং কেবল বৃষ্টিপাতের কারণেই ফসল ভাল হয়েছে, তবে তা শির্ক্ আকবার বলে গণ্য হবে। আর বক্তা যদি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শির্ক্ আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহ্র সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে কোন জাগতিক বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এক ব্যক্তি অন্য জনকে যদি বলে, 'আল্লাহ্ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না', কিংবা 'আল্লাহ্ ও আপনি যা চান তাই হবে', তবে তা উপরের কথাগুলির মত বক্তার বিশ্বাস অনুযায়ী শির্ক্ আকবার বা শির্ক্ আসগার বলে গণ্য হবে। কিন্তু তিনি যদি বলেন, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং এরপর আপনি যা ইচ্ছা করেন . . . " তবে তা কোন রকম শির্ক্ বলে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাতে সবকিছু হওয়ায় যেমন বক্তার বিশ্বাস প্রকাশ পায় তেমনি তার কথায় অন্য জনকে আল্লাহ্র সমকক্ষ জ্ঞাপক কোন বক্তব্যও নেই। বিশ্বাস থাকার পরও মুখ দিয়ে **'তারপর'** এর পরিবর্তে সমতুল্য জ্ঞাপক শব্দ **'এবং'** যোগ করাই তার উক্তি শির্ক্ আসগারে পরিণত হয়ে যায়। শির্ক্ আসগার জাতীয় এরকম কথাবার্তার মধ্যে আছে, 'আমি আল্লাহ্র ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি', 'উপরে আল্লাহ্ এবং নীচে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই', 'আল্লাহ্ ও আপনি না হলে কাজটি হতো' না ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এরূপ বাক্যের সংশোধনী হলো 'ও' বা 'এবং' অব্যয়ের বদলে 'অতঃপর' বা 'তারপর' শব্দ ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তাঁর 'হও' বলাতেই তা সব ঘটে যায়। এরূপ 'ইচ্ছা'র অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো এরূপ অলৌকিক ইচ্ছা আছে, বা অন্য কাউকে মহান আল্লাহ্ খুশী হয়ে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তবে তা শির্ক্ আকবার এবং মহান আল্লাহ্র নামে জঘন্য মিথ্যাচার।

হুযাইফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমরা (এরূপ) বলবে না : 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে' বরং বলবে, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করে।" আবু দাউদ আস-সুনান ৪/২৯৫, বাইহাকী- আস সুনানুল কুবরা ৩/২১৬, আলবানীর মতে সহীহ্।

অন্য হাদীসে আঈশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমরা বলবে না : যা আল্লাহ্ চান এবং মুহাম্মাদ (সা.) চান, বরং বলবে : 'যা আল্লাহ্ একাই চান।" আবু ইয়ালা-আল-মুসনাদ ৮/১১৮।

এখানে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে 'আল্লাহ্ যা চান, অতঃপর আপনি যা চান' বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্র (সা.) ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীসে 'একমাত্র আল্লাহ্ যা চান' বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬.৩.৪। গাইরুল্লাহ্র নামে শপথ করা :

গাইরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মূলত শির্ক্ আকবার। অনেক হাদীসে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে কা'বা ঘরের নামেও শপথ করাকে শির্ক্ বলা হয়েছে, এবং কা'বা ঘরের প্রতিপালকের কসম করতে বলা হয়েছে।

তবে যদি কোন মু'মিন নওমুসলিম হওয়ার কারণে অভ্যাস অনুসারে গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথ করে ফেলে তবে তা শির্‌ক্ আসগার বলে গণ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোন কোন আলিম।

ইবনে উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কারো নামে শপথ করল সে কুফ্‌রী করল বা শির্‌ক্ করল।" তিরমিযী-আস-সুনান ৪/১১০, আবু দাউদ ৩/২২৩।

প্রাচীন যুগ থেকে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে শপথের সত্যতা প্রমাণ করতে তাদের বিশ্বাস মতে অলৌকিক, পবিত্র ও ভক্তিপূত নামের শপথ করার প্রচলন রয়েছে। কারো নামে শপথ করার সুনিশ্চিত অর্থ হচ্ছে শপথকারী উক্ত নামের অধিকারী সত্তাকে উলুহিয়্যাতের তথা ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথ শির্‌ক্ হওয়ার কারণ এটাই।

৬.৩.৫। অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা :

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্‌ক্ . . . ।" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। তিরমিযী আস-সুনান- ৪/১৬০, ইবনে হিব্বান আস-সহীহ- ১৩/৪৯১, আবু দাউদ- ৪/১৭, ইবনু মাজাহ- ২/১১৭০।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করল সে শির্‌ক্ করল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর কাফ্‌ফারা কি? তিনি বলে, এ কথা বলবে যে, 'হে আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, আপনার শুভাশুভত্ব ছাড়া কোন শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া (প্রকৃত) কোন ইলাহ নেই।" আহমাদ আল-মুসনাদ- ২/২২০, আলবানীর মতে সহীহ।

ইরাম ইবনুল হুসায়িন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় (আমার উম্মাত নয়), যে শুভাশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য বা গাইবী কথা বলে, অথবা যার জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোন (সূতা-দাগা ইত্যাদিতে) গিট দেয়। আর যদি কেউ কোন গণক-জ্যোতিষী বা অনুরূপ কোন ভাগ্য বা ভাবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ দ্বীনের সাথে কুফ্‌রী করল।" হাইসামী মাজমাউ যাওয়াইদ- ৫/১১৭। হাদীসটি সহীহ্।

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, তিথি, সময়, বস্তু, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোন প্রভাবের ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শির্ক্ আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস না করেন, বরং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ কিন্তু কথাচ্ছলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে তা শির্ক্ আসগার বলে গণ্য হবে।

৬.৩.৬। ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাগ্য বক্তার কথায় বিশ্বাস করা :

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞান তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। মহান আল্লাহ্ ছাড়া কারো ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহ্র ইলমের বিশেষণে অন্যকে শরীক করা হয়। এ জন্য ইসলামে গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোন প্রকারের গোপন জ্ঞানের দাবীদার বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দাবীদারদের নিকট গমন করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত হাদীসে আমরা তা দেখেছি। অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"যদি কেউ কোন গণক বা ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ দ্বীনের প্রতি কুফরী করল।" আহমাদ, আল-মুসনাদ ২/৪২৯, আলবানী সহীহুত তারগীব ৩/৯৭-৯৮।

আরেকটি হাদীসে সাফিয়্যাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"যদি কেউ কোন গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।" মুসলিম- ৪/১৭৫১।

যদি কেউ এরূপ জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, পীর ফকীর ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবীদারকে সত্যই 'গাইবী' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তবে তা শির্ক্ আকবার বলে গণ্য। আর যদি বিশ্বাস করে যে গোপন জ্ঞান, ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে, অন্য কেউ জানে না বা জানতে পারে না, কিন্তু কৌতুহল বশত প্রশ্ন করে তবে তা কঠিন পাপ ও শির্ক্ আসগার।

অনুরূপভাবে কারো কোন জিনিষ চুরি হলে 'ইলম দ্বারা চোর ধরা' বা দু'আর মাধ্যমে গাইবের কথা জানার চেষ্টা করাও 'গণকবৃত্তি' বলে গণ্য। চুরি হওয়া জিনিষের মালিক চুরিকৃত দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য দু'আ করতে পারেন কিংবা জাগতিক উপকরণের সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু কে চুরি করেছে বা চুরিকৃত দ্রব্য কোথায় আছে তা জানার জন্য

জাগতিক উপকরণ (যেমন গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্য) ছাড়া 'গাইব' জানার চেষ্টা করার সুযোগ নেই।

৬.৩.৭। রশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করা :

বিভিন্ন হাদীসে তাবিয, কবজ, রশি, সূতা, তাগা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যবহার শির্ক্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীসে ঝাড়-ফুঁক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য অনেক আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ দ্বারা যেমন ঝাড়-ফুঁক বৈধ, তেমনি এরূপ আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ লিখে (জ্ঞাত বা বর্তমান অসুখ-বিষুখ বা বিপদাপদের ক্ষেত্রে) 'তাবিয' আকারে ব্যবহারও বৈধ। অন্যান্য আলিমদের মতে কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থবোধক দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেয়া বৈধ, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাবিয ব্যবহার কোনভাবেই বৈধ নয়, কারণ তা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীসে কুরআনের আয়াত বা ভাল দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেয়া বৈধ বলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে অনেককে ফুঁক দিয়েছেন। তবে তিনি নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কাউকে তাবিয লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোন সহীহ্ বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং হাদীসে তাবিয ব্যবহার সর্বদাই নিষেধ করা হয়েছে। এর মূল কারণ তাবিযের বিপদাপদ বা অসুখ-বিসুখ দূর করার বা ঠেকিয়ে রাখার নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং আল্লাহর উপর তাদের নির্ভরশীলতা থাকে না। প্রকারান্তরে তারা আল্লাহর সাথে শির্ক্ করে। অর্থহীন কথা, সংকেত, অক্ষর বা সংখ্যা দ্বারা তাবিয লিখে ব্যবহার করা স্পষ্ট শির্ক্ এবং সর্বোতভাবে নিষিদ্ধ।

উকবা ইবনু আমীর আল-জুহানী বলেন,

"একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ্র (সা.) নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি নয় জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি বললেন, এর দেহে একটি তাবিয আছে। তখন তিনি (লোকটির জামার ভিতর) তাঁর হাত ঢুকিয়ে তাবিযটি ছিঁড়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন, যে তাবিয ঝুলালো সে শির্ক্ করলো।" আহমাদ, আল-মুসনাদ ৪/১৫৬, হাইসামী, মাজমাউয যাওযাইদ ৫/১০৩। আলবানীর মতে সহীহ্ (১/৮০৯)।

অন্য একটি হাদীসে আছে, একদিন ইবনু মাসুদ (রা.) বাড়ীতে ফিরে তাঁর স্ত্রীর গলায় একটি সূতা ঝুলানো দেখে টান দিয়ে তা ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শির্ক্ করার কোন প্রয়োজন নেই। তার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশ ও নিয়ম অনুযায়ী রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে বলেন। (সারমর্ম) আহমাদ, আল-মুসনাদ ১/৩৮১, আবু দাউদ, সুনান ৪/৯। হাদীসটি সহীহ।

৬.৩.৮। কাউকে শাহানশাহ বলা :

মহান আল্লাহ্ই এ বিশ্বের প্রকৃত মালিক, বাদশাহ ও প্রতিপালক। তবে জাগতিক অর্থে মানুষকে রাজা বলার অনুমতি ও প্রচলন রয়েছে। কুরআন কারীমেও এরূপ ব্যবহার রয়েছে, তবে জাগতিক অর্থেও কাউকে রাজাগণের রাজা, 'শাহানশাহ' ইত্যাদি গালভরা উপাধিতে আখ্যায়িত করতে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"মহান আল্লাহ্র নিকট ঘৃণ্যতম নাম হলো যে, কোন মানুষ নিজকে 'শাহানশাহ' বা 'রাজাগণের রাজা' নামে আখ্যায়িত করবে, অথচ মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন রাজা নেই। অন্য বর্ণনায় : কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে নিন্দিত হবে ঐ ব্যক্তি যাকে (পৃথিবীতে) 'রাজাগণের রাজা' বা 'শাহানশাহ' নামে আখ্যায়িত করা হয় অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কোন রাজা নেই।" সহীহ বুখারী- ৫/২২৯২, মুসলিম- ৩/১৬৮৮।

৬.৩.৯। কাউকে রাব্ব্ বা আব্দ বলা :

জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে 'অমুকের পালনকর্তা', মালিক বা মনিব অর্থে 'অমুকের রাব্ব্' বলা যায়। অনুরূপভাবে জাগতিক দাসত্ব অর্থে একজনকে অন্যের 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দা, দাস বা চাকর বলা যায়। তবে এরূপ শব্দ ব্যবহার না করতে হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এতে শব্দ ব্যবহারের মধ্যে শির্ক্ হয়ে যায়, যদিও বিশ্বাসে শির্ক্ না থাকে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের কেউ (কারো মালিকের বেলায়) বলবে না : তোমার রাব্বকে খাবার দাও, তোমার রাব্বকে ওযু করাও, তোমার রাব্বকে পানি পান করাও, বরং সে যেন (নিজ মালিককে) সাইয়িদী অর্থাৎ আমার নেতা, মাওলাইয়া অর্থাৎ আমার অভিভাবক বলে। আর তোমাদের কেউ (নিজের দাস বা চাকরকে) 'আমার বান্দা' বা 'আমার বান্দী' বলবে না, কারণ তোমরা সকলেই তো আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই তো আল্লাহর বান্দী। বরং বলবে আমার যুবক বা ছেলে, আমার যুবতী বা মেয়ে কিংবা আমার কর্মচারী।" সহীহ্ বুখারী- ২/৯০১, মুসলিম- ৪/১৭৬৪-১৭৬৫।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, মালিককে 'রাব্ব' বলা এবং দাস বা চাকরকে 'বান্দা' বলা মূলত বৈধ হলেও শব্দের শিরকের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা বর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধারণ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেও অনেক আদব ও শিরকের বিষয় রয়েছে, যা শির্ক্ আকবার না হলেও শির্ক্ আসগার বলে গণ্য হতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শির্ক্ থেকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বদা শির্ক্ থেকে তাওবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"হে মানুষেরা! শির্ক্ থেকে আত্মরক্ষা করো; কারণ শির্ক্ পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সূক্ষ্মতর। তখন এক ব্যক্তি বলেন, হে রাসূলুল্লাহ্! তা যদি পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সূক্ষ্মতর হয় তবে কিভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন,

তোমরা বলবে, হে আল্লাহ্ আমরা জেনেশুনে আপনার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, এবং যা না জানি তা থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

সপ্তম অধ্যায়
শির্ক্ প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ্

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে তাওহীদের দাওয়াতই সকল নবী-রাসূল (আ.)-গণের মূল দা'ওয়াত। বস্তুত শির্ক্ই মানব জীবনের কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির সকল আশা চিরতরে নস্যাত করে দেয়। এ জন্য শয়তান সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে সকল মানুষকে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে। তার সাফল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহুদী, খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকগণ। এ সকল মানুষ মূল ওহী বিকৃত বা বিলুপ্ত করে ওহীর ব্যাখ্যা ও দ্বীনের নামে শির্ক্, কুফ্র ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলন করে এবং এগুলোকেই মূল তাওহীদ ও দ্বীন বলে দাবী করে। তবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত থাকায় শয়তান কর্তৃক তাদেরকে শির্কে লিপ্ত করার প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি।

মহান আল্লাহ্র সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন শরীয়ত ও দা'ওয়াত হিসাবে ইসলামে শির্ক্ প্রতিরোধের জন্য কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে (১) মুশরিকদের পরিচিতি ও তাদের শির্কী বিশ্বাস ও কর্মগুলি উল্লেখ করা, যেন মু'মিনরা কখনো সেগুলিতে লিপ্ত না হয়, (২) শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা, যেন মু'মিনগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, (৩) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা, (৪) শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা এবং (৫) শিরকের পথগুলি বন্ধ করা।

৭.১। মুশরিকগণের পরিচিতি ও শির্কী কর্মসমূহ :

মুশরিকদের পরিচিতি : কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুশরিকদের একটি সুন্দর শ্রেণীভাগ করেছেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থদ্বয়ে যথাক্রমে মুশরিকদেরকে তিন ও চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

৭.১.১। জ্যোতিষী, প্রকৃতি পূজারী বা নক্ষত্র পূজারীগণ :

এরা দাবী করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। এদের ইবাদাত করলে পৃথিবীতে উপকার পাওয়া যায়। তারা বলে, গবেষণা করে তারা উদ্ঘাটন করেছেন যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ব্যক্তির সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এগুলির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান সত্তা আছে যার ভিত্তিতে তারা যাত্রা ও চলাচল করে। এরা এদের পূজারীদের বিষয়ে অচেতন নয়। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামে মন্দির তৈরী করেছে এবং সেগুলিতে তাদের ইবাদাত করে।

৭.১.২। মুশরিকগণ :

সনাতন মুশরিকদের একটি বড় অংশ তাদের পূর্ববর্তী যুগের (মৃত) পুণ্যবান বুযুর্গগণের ইবাদাত করে। এরা বিশ্বাস করে যে বুযুর্গগণ তাদের পুণ্যকর্মের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, ফলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে উলুহিয়্যাত বা উপাস্যত্ব প্রদান করেছেন। এভাবে তারা অন্যান্য বান্দাদের ইবাদাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাদের বিশ্বাস এসব বুযুর্গদেরকে মাধ্যম হিসাবে ধরে তাদের ইবাদাত না করে সরাসরি শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদাত করলে তা কবুল হবে না। তারাই উপাসনাকারীকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন, যেমন পৃথিবীতে ক্ষমতাধর কোন ব্যক্তির সাক্ষাত পাবার জন্য তার অধস্তন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করতে হয়। মুশরিকদের বিশ্বাস, এই মৃত বুযুর্গগণ শুনেন, দেখেন, তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং তাদের সাহায্য করেন। প্রথম যুগের মুশরিকরা এ সকল বুযুর্গদের প্রতিকৃতি বা মূর্তি বানিয়ে সামনে রেখে বুযুর্গদের ইবাদাত করতো, কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদেরকে ভুলে গিয়ে মূর্তিকেই উপাস্য ভেবে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়।

মুশরিকদের অপর একটি অংশ সরাসরি তাদের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা বা তাদের নামে মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির পূজা করে। এদের অনেকে আবার প্রকৃতিতে যা কিছু কল্যাণকর বা শক্তিশালী মনে করে তারও পূজা করে যেমন হিন্দুরা কল্পিত দেব-দেবী ছাড়াও গাছ-মাছ, পশু ইত্যাদিরও পূজা করে। পারসিকরা অগ্নিপূজক ছিল।

উল্লেখ্য যে, মুশরিকরা মূলত ইবাদাতে শির্‌ক্ করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বদলে বা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যদের শরীক করে ইবাদাত করে। তবে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত তথা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়ে তারা মুসলিমদের সাথে একমত।

৭.১.৩। খৃষ্টানগণ :

খৃষ্টানগণ দাবী করে যে ঈসা মাসীহ (আ.) এর সাথে আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্য আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির উর্ধে। কাজেই তাঁকে 'আব্‌দ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস বা 'বান্দা' বলা উচিত নয়। কারণ তাঁকে 'বান্দা' বললে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান বানিয়ে দেয়া হয়। এরূপ করা তাঁর মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী। সর্বোপরি এতে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর যে বিশেষ নৈকট্যের সম্পর্ক আছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয়। এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য তাঁকে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বলতে পছন্দ করেন। তাদের যুক্তি এই যে, পিতা তাঁর পুত্রকে বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাঁকে প্রতিপালন করেন। এ জন্য 'পুত্র' পদটিই তাঁর মর্যাদার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাঁকে 'আল্লাহ্' বলতে শুরু করেন (নাঊযুবিল্লাহ)। তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ্ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে অবস্থান করেছেন। আর এজন্যই তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা ইত্যাদি মানুষের অসাধ্য অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম হন (যা প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ্র নির্দেশেই সংঘঠিত হতো)। কাজেই তাঁর কথাই আল্লাহ্র কথা এবং তাঁকে ইবাদাত করা অর্থ আল্লাহ্র ইবাদাত করা।

পরবর্তী প্রজন্মের খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসা (আ.)-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলার এ সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বিরাজ করে। ফলে তারা 'আল্লাহ্র পুত্রত্ব' বলতে প্রকৃত পুত্রত্বই বুঝতে থাকে। কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্। (পরবর্তীতে খৃষ্টান যাজকরা এক দুর্বোধ্য ও জটিল তাত্বিক বিষয়ের অবতারণা করত আল্লাহ্র ত্রিত্ব (Trinity) বা 'তিন সত্তার মিলিত রূপ এক আল্লাহ্' - এই বিশ্বাসের জন্ম দেয়। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই তিন সত্তা হচ্ছেন 'পিতা আল্লাহ্', 'পুত্র আল্লাহ্' এবং 'পবিত্র আত্মা আল্লাহ্'। এ ছাড়া তারা ঘোষণা করল, এ ব্যাপারে কোন যৌক্তিকতার প্রশ্ন না করেই কেবল বিশ্বাস করতে হবে)।

৭.১.৪। কবর পূজারীগণ :

শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর বালাগুল মুবীন গ্রন্থে বলেন, 'মুশরিকদের চতুর্থ দলটি হলো কবর পূজারীদের দল। তাদের দাবী হলো, যখন আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দা ইবাদাত-বন্দেগী, সাধন-ভজন দ্বারা আল্লাহ্র দরবারে দু'আ কবুল হওয়ার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন, এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মা বিরাট শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী হয়ে থাকে। সুতরাং যে লোক এমন বুযুর্গের আকৃতি ও চেহারার ধ্যান করে অথবা তাদের থাকার স্থান এবং কবরকে খুব বিনয়, নম্রতা ও ভক্তি সহকারে সিজদাহ করে, তার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুযুর্গের আত্মা অবহিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও পরকালের তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দিয়ে তার জন্য সুপারিশকারী হয়।

কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের যে ইবাদাত-বন্দেগী এই পৃথিবীতে করা হয় এবং তাদের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করা হয়, ঐসব আত্মা ও দেহসমূহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন তখন তারা বলবে 'আমরা এ সম্বন্ধে অবগত নই। পূজারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কিংবা আল্লাহ্র দরবারে তাদের জন্য শাফা'আত করা তো দূরের কথা, তাদের কাজকেই অদৌ স্বীকৃতি দিবেন না।"

৭.২। শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা :

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী মুশরিক সম্প্রদায়গুলি জীবিত, মৃত ও জড় বস্তুর মধ্যকার বিভিন্ন সৃষ্টির ইবাদাত করত। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তাদের এসব বিভ্রান্তির কারণ সমূহ নিম্নরূপ :

৭.২.১। বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভ্রান্তি :

মুশরিকদের দাবি ছিল, পুণ্যবান বিশেষ বান্দাগণ আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় এবং এদের সাথে আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ সব মানুষের মু'জিযা, কারামাত বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা তাঁদের উলুহিয়্যাত বা ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতার প্রমান হিসাবে পেশ করত। তাদের মতে, মহান আল্লাহ্‌ই এদেরকে সে মর্যাদা দিয়েছেন। কাজেই এদের ইবাদাত করলে স্বয়ং আল্লাহ্ খুশি হন এবং এদের ইবাদাত করলে এরাই মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেন। তাদের এ দাবীর সারমর্ম হলো, এ সকল বুযুর্গের ইবাদাত না করে শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদাত করলে তা কবুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ্ অতি মহান ও অতি উর্ধে। তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তাঁর কোন ইবাদাত কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুযুর্গের ইবাদাত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন। তাদের এ সকল 'যুক্তি' বা দাবির বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন,

> "আর যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহণ করেছে তারা বলে, 'আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে।' তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ্ তার ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" সূরা যুমার- ৩৯:৩ আয়াত।

৭.২.২। বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভ্রান্তি :

মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা 'দলিল' ছিল সুপারিশের দলিল। তারা স্বীকার করত যে, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তবে এ সকল বিশেষ বান্দাকে আল্লাহ্ বিশেষভাবে ভালবাসেন, কাজেই এদের সুপারিশ তিনি প্রত্যখ্যান করেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করে তারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফা'আতকারী)। বল (হে রাসূল!), তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান ও সুপবিত্র এবং তারা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধে।" সূরা ইউনুস - ১০:১৮।

কাফিরদের এরূপ কর্মের অসারতা ও স্ববিরোধিতা ধরিয়ে দিলে এবং সকল যুক্তিতে পরাস্ত হলে তারা প্রচলনের দোহাই দিত। যুগযুগ ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা যা করে আসছেন তা কিভাবে ভুল হতে পারে!

মহান আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, ফিরিশতাগণ ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ সুপারিশ করবেন, তবে তা তাদের ইচ্ছামত নয়। বরং সুপারিশ বা শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র। আল্লাহ্ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন তিনি সুপারিশ করবেন কেবলমাত্র তার জন্য যার বিষয়ে আল্লাহ্ অনুমতি দিয়েছেন এবং যার উপর আল্লাহ্ নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন। কাজেই সুপারিশের কল্পনা বা দাবী শির্ক্, যেমন তাদের ইবাদাত করা শির্ক্।

৭.২.৩। শয়তানের প্রতারণা :

শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা। সাধারণভাবে শয়তান ধার্মিক মানুষদেরকে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও পুণ্যবান বুযুর্গদের বিষয়ে ভক্তির মাত্রা বাড়াতে শিরকের মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্ররোচনা দেয় বলে হাদীস থেকে জানা যায়। নূহ (অঃ) এর জাতির শির্ক্ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তারা বলল, 'তোমরা কখনো তোমাদের ইলাহদেরকে (উপাস্যদেরকে) পরিত্যাগ করো না, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্রকে।" সূরা নূহ- ৭১:২৩

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মু'মিন মুসলিম। আদম (আ.) এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল। এর পর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতি ভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শির্ক্ শুরু হয়। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত। এ সকল বর্ণনার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্র - এই পাঁচ ব্যক্তি খুব নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাঁদের বিলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোন কোন অনুসারীকে শয়তান প্ররোচনা দেয়, তোমরা এই আউলিয়াদের মাজলিস বা স্মৃতি বিজড়িত স্থনগুলিতে তাঁদের জন্য কিছু স্মৃতি চিহ্ন বা স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করে রাখো। তাঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিলে তা তোমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহ্র ইবাদাত বন্দেগী করতে উৎসাহিত করবে। ভক্ত অনুসারীরা তাই করে। এরপর যখন এরাও মারা গেল, তখন পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে ইবলিশ ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু ছবি করে রাখেন নি, তারা তো এঁদের 'ভক্তি' (তথা ইবাদাত) করত এবং এঁদেরকে ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত। তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করতে শুরু করল। পরবর্তী পর্যায়ে শয়তান বিভ্রান্ত লোকজনকে বলল, এই ছবি বা মূর্তি গুলোই তোমাদের প্রকৃত উপাস্য, ফলে তখন থেকে মানুষ পাকাপাকি মূর্তি পূজক হয়ে পড়ল। বুখারী- ৪/১৮৭৩ (সার সংক্ষেপ)।

৭.২.৪। বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ :
কুরআন হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের অন্যতম কারণ হলো পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনুসরণ। আমরা ইতোপূর্বে আরবের মুশরিকদের প্রসঙ্গে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের শিরকের সকল যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতেন তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি হিসাবে সমাজের প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের কর্মকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করত এবং শির্ক্ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করত।

ইহুদী-খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট। তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিকৃত বাইবেলও একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদাতের নির্দেশ দেয় এবং গাইরুল্লাহর উপাসনা কঠিনভাবে নিষেধ করে। বাইবেলের অজস্র বিকৃত সংস্করণের কোনটিতেই কোথাও 'ত্রিত্ববাদ' এবং ঈসা (আ.) এর ইবাদাত করার স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এ সকল বিষয় তাদের কাছে সুস্পষ্ট করার পরও তারা তাদের শির্ক্ পরিত্যাগ করতে চায় না। মূলত তাদের যুক্তি একটিই, পৌল ও তার অনুসারী মুশরিকদের প্রতি ভক্তি এবং শিষ্যগণের নামে প্রচলিত কিছু মিথ্যা কথার ভিত্তিতে তাদের অনুসরণের দাবী।

৭.২.৫। নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য :
অনেক সময় মানুষ নিজের বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দের অনুকরণপ্রিয়তা বা তাদের বিরোধিতার অনাগ্রহ তাকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। একজন সাধারণ মুশরিক যখন কুরআনের যুক্তিগুলি নিয়ে চিন্তা করে তখন শিরকের অসারতা ও তাওহীদের আবশ্যকতা বুঝতে পারে। তার চিন্তা এরূপ ধর্মগুরু বা সমাজপতিদের কাছে প্রকাশ করলেও তারা যুগযুগ ধরে বিষয়টির প্রচলন অথবা অমুক বুযুর্গ, যাজক বা ধর্মগুরু এরূপ বলেছেন ও করেছেন উল্লেখ করে বলেন, ওদের চেয়ে তুমি বেশী জানো? ইত্যাদি যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে বিবেকের ডাক ছেড়ে সামাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। এদের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন (কিয়ামাতের দিন) তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা দুর্বলদেরকে বলবে, 'তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই ছিলে অপরাধী।' দুর্বলরা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাইত দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে ছিলে যেন আমরা আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি।" সূরা সাবা- ৩১:৩৩। অনুরূপ- ১৪:২১।

৭.২.৬। ইবাদাতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি :
ইবাদাতের অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির কারণেও মানুষ শির্‌কে লিপ্ত হয়। যেমন ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির নামে মানুষ কোন বুযুর্গের উদ্দেশ্যে মানত বা উৎসর্গ করে। অথচ দু'আ কবুলিয়্যাতের জন্যই মানুষ মানত, নযর, উৎসর্গ, সিজদা ইত্যাদি করে। আর এসব অলৌকিক বা অপার্থিব প্রার্থনাই ইবাদাতের মূল ও প্রধান প্রকাশ।

খৃষ্টানগণ এভাবেই ঈসা (আ.) এর মাতা মারইয়াম (আ.) এর ইবাদাত করে। তারা তাঁকে আল্লাহ্ বা স্রষ্টা বলে দাবী করে না। তবে 'ঈশ্বরের মাতা' বা 'আল্লাহ্‌র বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত মানুষ' হিসাবে ফিলিস্তিনে তাঁর কবরে এবং সকল গীর্জায় তাঁর মূর্তি তৈরী করে মূর্তির সামনে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অলৌকিক সাহায্যের আশায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। আর প্রার্থণা যেন 'মা-মেরী' তাড়াতাড়ি পূরণ করেন সে আশায় তাঁর নিকট মানত, নযর ইত্যাদি পেশ করে বা সিজদা করে পড়ে থাকে। মারইয়াম (আ.) কে যে তারা মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করেছে তা কুরআনেও উল্লেখিত আছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "আল্লাহ্ যখন বলবেন, হে মারিয়াম তনয় ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? . . . ।"
> সূরা মায়িদা- ৫:১১৪।

৭.৩। শির্‌কের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা :
এ সম্পর্কে নীচের বিষয়গুলি সহজেই বোধগম্য এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে।

ক. যিনি একমাত্র রাব্ব তিনিই একমাত্র ইলাহ্ : সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একক ক্ষমতা যেহেতু আল্লাহ্‌র এবং সমগ্র সৃষ্ট জীব একত্র হয়েও যখন একটি অনু সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে না তখন ইবাদাত পাওয়ার অধিকার বা যোগ্যতা কার থাকতে পারে?
খ. মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না : একজন মালিক তার দাসকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু নিজের সম্পদের মালিকানা বা অংশিদার করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ও তার কিছু বান্দাকে (আম্বিয়া-আওলিয়া) ভালবাসেন, কিন্তু তিনি কখনো বলেন নি যে তিনি কাউকে তাঁর ক্ষমতার অংশীদার করেন। মানুষই যেখানে তার দাস-দাসীকে অংশীদার করে না সেখানে সে কিভাবে দাবী করতে পারে যে আল্লাহ্ তাঁর দাসকে অংশিদার করেন?
গ. ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র, কাজেই অন্যের ইবাদাত কেন?
ঘ. আল্লাহ্ আর কাউকে কোন ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি?
ঙ. মুশরিকদের তৈরী বা কল্পিত কোন উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না।
চ. মালিককে রেখে দাসকে মা'বুদ বানানো চূড়ান্ত বোকামী।
ছ. মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না।
জ. আল্লাহ্‌র মাহবূব বান্দারা মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট।

ঝ. মুশরিকগণ পুণ্যবানগণের সাফা'আত পাবে না।

ঞ. অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবী অস্বীকারের পরিণতি : উপরের যুক্তিগুলি জানার পর আর কারো মধ্যে শির্ক্ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তি বা বিবেক নয়, অজ্ঞতা, অন্ধ আবেগ ও মোহ হেদায়াতের পথে বড় বাধা। সকল যুক্তি এখানে শেষ হয়ে যায়। এ জন্য দেখা যায় নামে মুসলিম পরিচয় থাকলেও কর্মে একজন লোক পীরের সিজদা করে, কবর পূজায় সময় কাটায় এবং ভাবে সে একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে অনেক পুণ্য অর্জন করছে। মহান আল্লাহ্ এ সকল কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে বলেন,

> "বল (হে মুহাম্মাদ সা.), 'আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দিব যারা কর্মে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ? তারা তো সে সকল মানুষ, দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করছে।" সূরা কাহাফ- ১৮:১০৩-১০৪।

৭.৪। শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা :

শির্ক্-কুফ্র মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্য় বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তা হচ্ছে :

৭.৪.১। শির্ক্ ভয়ঙ্করতম পাপ :

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শির্ক্-কুফ্র মানব জীবনের ভয়ঙ্কর পাপ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "বল (হে মুহাম্মাদ সা.), 'এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই : তা এই যে, তোমরা তাঁর কোন শরীক সাব্যস্ত করবে না . . . .।" সূরা আনআম- ৬:১৫১।

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসুউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

৭.৪.২। কুফ্র-শির্কের পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না :

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে সকল পাপ বর্জন করত আল্লাহ্র রাস্তায় ফিরে আসা ও তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে তাওবা ছাড়াও পুণ্যকর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অপার করুণায় বা শাস্তির মাধ্যমে শির্ক্ ছাড়া বান্দার অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।" সূরা নিসা- ৪:৪৮, অনুরূপ- ৪:১১৬।

৭.৪.৩। শির্‌ক্‌-কুফ্‌র পূর্ববর্তী সকল পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে দেয় :

অন্য সকল পাপের সাথে শির্‌ক্‌-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধারণভাবে পাপের কারণে কারো পূর্বে অর্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

"তোমার প্রতি (হে রাসূল) ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত।" সূরা যুমার- ৩৯:৬৫।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

"কেউ ঈমানের সাথে কুফ্‌রী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" সূরা মায়িদা- ৫:৫।

৭.৪.৪। শির্‌ক্‌-কুফ্‌র জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ :

শির্‌ক্‌ মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভ করতে পারে, অথবা শাস্তি ভোগের পর জান্নাত লাভ করবে, কিংবা কারো শাফা'আতের কারণে শাস্তি ছাড়াই জান্নাত লাভ করবে। সকল পাপীই মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারে। কিন্তু শির্‌কে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনই আশা নেই, জাহান্নামই তাদের অনন্তকালের গন্তব্যস্থল। জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পন্থীদের আবাসস্থল। এ জন্য মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

"কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করলে আল্লাহ্‌ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন, এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম; আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" সূরা মায়িদা- ৫:৭২

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে, পৃথিবী পরিমাণ পাপসহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে, আমি সম পরিমাণ ক্ষমা সহ তার সাথে সাক্ষাৎ করব। মুসলিম- ৪/২০৬৮।

৭.৫। শিরকের উৎস সমুহ বন্ধ করা :

শির্‌ক্‌ প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের বিশেষ ব্যবস্থার অন্যতম হচ্ছে শির্‌কের উৎসগুলি বন্ধ করা। আমরা দেখেছি যে, শির্‌ক্‌ মূলত দুটি বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয় : ১. মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অব-ভক্তি বা কু-ধারণা (তথা তাঁর মর্যাদার কোন বিষয়কে সৃষ্টির পর্যায়ে ধারণা করা) এবং ২. বান্দার প্রতি অতিভক্তি বা অতি-ধারণা। আর এদুটি বিষয় পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

৭.৫.১। ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা :

নেককার বা ওলী-আল্লাহ্গণের বিষয়ে অতিভক্তি ছিল শির্কের অন্যতম কারণ। মুসলিমদের একাংশের মধ্যে একই কারণে পীর-পূজা ও কবর-পূজার প্রচলন হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অতিভক্তির পথ রোধ করা হয়েছে।

প্রথমত, ঈমান ও তাকওয়াকে কুরআন-হাদীসে বেলায়াত বা ওলীত্বের ভিত্তি ধরা হয়েছে। আল্লাহ্র প্রিয় নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা বা ওলীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে অলৌকিকতা, কারামাত ইত্যাদির কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। এটা এজন্য যে মু'মিন যেন কারো অলৌকিক কর্ম দেখে তাকে নিশ্চিত ওলী বলে ধারণা না করে।

দ্বিতীয়ত, বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সকল মু'মিনই আল্লাহ্র ওলী। কিন্তু নির্ধারিতভাবে কাউকে 'ওলী' বলে নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, ওহীর নির্দেশনার বাইরে কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী বলতেও আপত্তি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

"কোন ব্যক্তিকেই তার নিজের আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.), আপনিও নন ?' তিনি বলেন, না, আমিও নই, যদি আল্লাহ্ আমাকে মহানুভবতা ও রহমত দিয়ে আবৃত করে না নেন।" বুখারী- ৫/২১৪৭, ২৩৭৩, মুসলিম- ৪/২১৬৯-২১৭১।

এমনকি সাহাবীগণ পুণ্যবান বুযুর্গদের নিকট চাওয়ার ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি পরিহার করতে পরামর্শ দিতেন। সাধারণভাবে মু'মিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অন্যদের জন্য দু'আ করতে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্র (সা.) নিকট দু'আ চাইতেন। তারা একে অপরের কাছেও কখনো কখনো দু'আ চেয়েছেন। এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে উমার (রা.) ওমরাহ্ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন, "আমাদেরকেও তোমার দু'আর মধ্যে মনে রেখো, ভুলে যেও না।" তিরমিযী- ৫/৫৫৯, আবু দাউদ- ২/৮০ ইত্যাদি।

৭.৫.২। মূর্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য :

আমরা দেখেছি যে, বিপদ-আপদে মূর্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে নিজের মনের আবেগ জানানো এবং বিপদ থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করার আগ্রহ শির্কের অন্যতম কারণ। দুর্বলচিত্ত মানুষ অদৃশ্য কোন কিছুর কাছে প্রার্থনা করে পুরো তৃপ্তি পায় না। মূর্ত কিছুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। এজন্য মৃত নেককার ব্যক্তির ইবাদাত করা বা তার প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশের জন্য মুশরিক ব্যক্তি একটি মূর্ত কিছু সন্ধান করে। এ জন্য মূল বাহন হচ্ছে ১. উক্ত ব্যক্তির সমাধি বা কবর, ২. উক্ত ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা দ্রব্য এবং উক্ত ব্যক্তির ছবি, মূর্তি বা প্রতিকৃতি। সাধারণত এগুলিকে কেন্দ্র করেই শির্ক্ আবর্তিত হয়।

ইসলামে শির্কের এ সকল উপকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেন কোনভাবে মানবীয় দুর্বলতা বা শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে কোন মু'মিন এগুলোর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে শিরকে নিপতিত না হয়। ছবি, প্রতিকৃতি, মূর্তি ইত্যাদি তৈরী, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ইত্যাদি কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থান যেমন কবর যেন

মানুষের অতিভক্তির বিষয়ে পরিণত না হয় সে জন্য কবরকেন্দ্রিক মসজিদ ও ইবাদাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি কবর স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু করা, পাকা করা, চুনকাম করা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরী করা [যা মানুষ পরবর্তীতে ইবাদাতের জন্যও ব্যবহার করতে পারে], কবরের উপরে কিছু লিখা বা বাতি জ্বালানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূর্তি, ছবি ও প্রতিকৃতির পাশাপাশি উঁচু কবর ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক হাদীসের মধ্যে একটি হচ্ছে,

যাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।" মুসলিম- ২/৬৬৭।

অষ্টম অধ্যায়

মুসলিম সমাজে শির্ক্ প্রবেশের প্রেক্ষাপট ও প্রচলিত শির্ক্-কুফ্র

৮.১. হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী :

সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের সবচেয়ে বড় বিষয় তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে তাঁর উম্মাতের মধ্যেও অনুরূপভাবে একই প্রকৃতির বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে। এ সকল হাদীস থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, পারস্যের অগ্নি উপাসক ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি যেভাবে আসমানী হিদায়াত পাওয়ার পরেও শির্ক্-কুফ্র ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল অবিকল সেভাবে মুসলিম উম্মাহ্র অনেকে শির্ক্-কুফ্র ও বিভ্রান্তির মধ্যে, এমন কি মূর্তিপূজায়ও নিপতিত হবে। পার্থক্য এই যে, মুসলিম উম্মাহ্র মূল দ্বীন নষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ্ এর মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্কে বিশুদ্ধভাবে হেফাযত করবেন এবং উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ সর্বদা হক্কের উপর থাকবেন, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করবেন। সাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"কিয়ামাতের পূর্বেই আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিলে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় 'ওয়াসান' (পূজিত দ্রব্য) এর ইবাদাত করবে।" আবু দাউদ- ৪/৯৭, ইবনু মাজাহ- ২/১৩০৪, আল মুসতাদরাক- ৪/৪৯৬।

৮.২। ইহুদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ :

মুসলিম সমাজের সকল শির্ক্, কুফ্র ও বিভ্রান্তির মূল ইহুদী আন্দোলন। ইহুদী পৌল যেমন কাশফ, কারামত ইত্যাদির দাবী করে খৃষ্টান সেজে ক্রমান্বয়ে খৃষ্টান ধর্মকে বিকৃত করে, তেমনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাবা নামক এক ইহুদী মুসলিম সেজে ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্বাস বিকৃত করে। পৌল জেরুযালেমের হাওয়ারী ও ইসরাঈলীয় খৃষ্টানদের মধ্যে সুবিধা করতে না পেরে ইউরোপে 'পরজাতিদের' নিকট গমন করে। ইবনু সাবা মক্কা-মদীনায় সুবিধা করতে না পেরে কুফা, বসরা, মিসর ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের নও-মুসলিমদের নিকট গমন করে। উভয়েরই দাবী দাওয়ার ভিত্তি ছিল, 'ওলীগণের অতিভক্তির' মাধ্যমে মুক্তি। তবে পৌল খৃষ্ট ধর্মের মূল উৎসগুলি বিকৃত করতে সক্ষম হয়, ফলে মূল খৃষ্ট ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইবনু সাবা এরূপ কিছু করতে সক্ষম হয় নি। সে অগণিত মিথ্যা কথা প্রচার ও প্রসার করে যায় এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ যেন কেউ গ্রহণ না করে তার ব্যবস্থা করে যায়। তবে সে মূল কুরআন ও সুন্নাহ্কে বিকৃত করতে পারে নি।

মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল শির্‌ক্‌ এর উৎস এই আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ। ইমাম পন্থী শীয়া এবং বিশেষ করে বাতিনী শীয়া, কারামাতিয়্যাহ, নুসাইরিয়্যাহ, দ্রুয ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শির্‌ক্‌-কুফ্‌র মুসলিম সমাজে ছড়িয়েছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভ্রান্ত দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। কারামাতিয়্যাহ, বাতিনীয়া, হাশাশীয়া, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিশিয়া, মরক্কো, ইয়েমেন, কূফা, বসরা, নজ্‌দ, খুরাসান, ভারত ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরা সাধারণ সরলপ্রাণ 'সুন্নি' মুসলিম, সূফি, দরবেশ ও ইল্‌মহীন নেককার মানুষের মধ্যেও এদের শির্‌ক্‌ প্রসার করতে সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌র সকল শির্‌কের উৎস মূলত এখানেই।

শীয়া মতবাদ : ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি

মুসলিম সমাজে শির্‌ক্‌ প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল শীয়া মতবাদে আকীদার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে অতিভক্তি। শীয়া মতবাদের বিষয়ে **'বিদ'আত ও বিভক্তি'** অধ্যায়ে (দশম অধ্যায়) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.৩। শিরকের বৈধতা দানের প্রবণতা

আমরা দেখেছি যে, ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিকগণ ফিরিশতা, নবী, জিন্ন ও প্রকৃত বা কাল্পনিক ওলীগণের ইবাদাত করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল বান্দাকে মহান আল্লাহ্‌ কিছু 'ক্ষমতা' দিয়েছেন। ইহুদী ষড়যন্ত্রকারী ও তাদের অনুসারী বিভ্রান্ত শীয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা অবিকল একই যুক্তিতে একই প্রকারের শির্‌ক্‌ মুসলিম সমাজে প্রচলন করে। ক্রমান্বয়ে সাধারণ মুসলিম সমাজেও এদের যুক্তিগুলি প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে। সাধারণত শির্‌কের দ্বারা যারা জাগতিকভাবে লাভবান হন সে সকল মানুষেরা এবং অনেক সরলপ্রাণ নেককার মানুষ ও আলিম বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এ সকল শির্‌ক্‌কে বৈধতা প্রদান করতে থাকেন। তাদের দাবী ছিল, নবী-বংশের ইমামগণ বা ওলীগণকে তো এরা স্রষ্টা বা প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে না, বরং আল্লাহ্‌কেই একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে। ওলীগণ মহান আল্লাহ্‌রই দেয়া ক্ষমতায় ক্ষমতাবান, এই বিশ্বাসেই তাদেরকে এরকম 'মর্যাদা' প্রদর্শন করা হয়। তাই এ বিশ্বাস ও ইবাদাত শির্‌ক্‌ নয়। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, এগুলি যদি শির্‌ক্‌ না হয় তা হলে ইহুদী, খৃষ্টান ও আরবের মুশরিকদেরকেও মুশরিক বলা যায় না। কেননা তারাও সুস্পষ্টভাবে আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করত এবং শরীক উপাস্যগণকে আল্লাহই ক্ষমতা দিয়েছেন বলে দাবী করত। কিন্তু কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রচলিত বিভিন্ন মতামতের প্রাধান্যের কারণে অনেক মুসলিমই এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনেকে এও বলেছেন যে, এরা যখন ইমামগণ বা ওলীগণকে ডাকে বা তাদের কাছে গাইবী সাহায্য চায় তখন মূলত আল্লাহ্‌র কাছেই চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত তার ইবাদাত করছে এবং এটা সুস্পষ্টভাবে শির্‌ক্।

৮.৪। মুসলিম সমাজে প্রচলিত শির্‌ক্-কুফ্‌র :

৮.৪.১। রুবুবিয়্যাতের শির্‌ক্ :

ইতোপূর্বে আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎকালীন আরব ও ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের শির্‌ক্ সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং শির্‌কী কর্মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও লিপিবদ্ধ করেছি। ইহুদী ও শীয়াদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পূর্বে প্রচলিত সকল শির্‌কী কর্মই মুসলিম সমাজের একাংশে প্রচলিত হয়ে গেছে। তবে পূর্ববর্তী যুগের সম্প্রদায়গুলির মত মুসলিম সমাজ সার্বিকভাবে শির্‌কে লিপ্ত হয় নি। এর কারণ মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ওহী (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস) অবিকৃত থাকা।

আমরা আরো দেখেছি যে, সকল প্রকারের শিরকের মূল উৎস হচ্ছে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা কোন বিশেষ কর্ম করার কারণে বা বিশেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ থেকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার কোন অলৌকিক ক্ষমতা, বিশ্ব পরিচালনায় হস্তক্ষেপ বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা লাভ করেছেন, করেন বা করবেন। শীয়ারা তাদের ইমামগণ সম্পর্কে যেভাবে বিশ্বাস করে যে তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন, সুন্নিদের মধ্যেও তদ্রুপ পীর-আওলীয়াগণ সম্পর্কে এসব অলৌকিকত্বের বিশ্বাস জন্মলাভ করে, বিশেষত প্রথমে সুফিবাদের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে পীরপুজা ও কবরপুজার প্রচলনের মাধ্যমে। সরাসরি মূর্তি পুজার প্রচলন না হলেও কার্যত সকল প্রকারের শির্‌কে মুসলিম সমাজের একাংশ যে জড়িত হয়ে পড়েছে এটা ধর্মের নামে তাদের অনুসৃত কর্মকাণ্ড থেকেই সহজে বুঝা যায়। তাই মুসলিম সমাজে প্রচলিত শির্‌ক্ সম্পর্কে এখানে আর নূতন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে এ পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত নূতন কয়েকটি বিভ্রান্তির বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। তা হচ্ছে ক্ষমতা বিষয়ক শির্‌ক্, ওসীলা বিষয়ক অস্পষ্টতা ও শির্‌ক্ এবং আল্লাহ্‌র হুকুম প্রদানের ক্ষমতায় শির্‌ক্।

৮.৪.১.১ ক্ষমতা বিষয়ক শির্‌ক্ :

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্‌ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা

হলো আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতের শির্‌ক্। শীয়াদের মধ্যে আলী (রা.), তাঁর বংশের ইমামগণ, ইমামগণের খলীফাগণ, তাদের মধ্যকার ওলী-আল্লাহগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে এমন অগণিত উদ্ভট কল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, এ সকল মানুষ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করার এরূপ কিছু ক্ষমতা রাখেন। শীয়াদের প্রভাবে সুন্নী সমাজেও এরূপ শির্‌কী বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরের পরে, ক্রুসেড ও তাতার আক্রমন চলাকালীন ও পরবর্তী সময়গুলিতে লেখা আওলীয়াগণের জীবনী, তাঁদের নামে প্রচলিত অনেক কথাবার্তা থেকে এরূপ অনেক বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের মধ্যে জন্মেছে। মূলত এ সকল গল্প, কাহিনী ও এ সকল যুগের কোনো কোনো আলিমের কথাই এ সকল শিরকের পক্ষের 'দলীল'। কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা দেন নি।

৮.৪.১.২। ওসীলা বিষয়ক শির্‌ক্ :

ওসীলা বিষয়ে সমাজে অনেক বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান। ওসীলা কখনো ইসলাম নির্দেশিত বা সুন্নাত-সম্মত কর্ম, কখনো সুন্নাত বহির্ভূত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম এবং কখনো তা আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতে বা উলুহিয়্যাতে শির্‌কের পর্যায়ে চলে যায়।

'ওসীলা' শব্দটির বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা এর অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন। ভাষাতত্ত্বের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে সময়ের আবর্তনের কারণে অথবা ভাষান্তরের কারণে। কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত প্রাচীন আরবী ভাষায় ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য। পরবর্তীকালে আরবী ভাষাতেই ওসীলা শব্দটির অর্থ হয় 'যদ্বারা নৈকট্য চাওয়া হয় বা 'নৈকট্যের উপকরণ'। আধুনিক যুগে আরবীতে এবং বিশেষ করে বাংলায় ওসীলা শব্দটি 'উপকরণ', 'মধ্যস্থতা', যন্ত্র, হাতিয়ার, দূত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের পরিবর্তনের কারণে শব্দটির বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে 'ওসীলা' প্রদান করবেন। স্বভাবতই এখানে ওসীলা অর্থ উপকরণ বা মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং ওসীলা অর্থ নৈকট্য। মহান আল্লাহ্ তাঁকে সর্বোচ্চ নৈকট্য ও নিকটতম মর্যাদা দান করবেন।

'ওসীলা' শব্দটি কুরআনে দু-স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন,

> "হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দিকে ওসীলা (নৈকট্য) সন্ধান কর (তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী নেক আমল দ্বারা) এবং তাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" সূরা মায়িদা- ৫:৩৫।

ইমাম তাবারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী ও মুফাস্‌সিরগণ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে বলেছেন এখানে ওসীলা সন্ধান এর অর্থ হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। তাবারী, তাফসীর- ৬/২২৬-২২৭ ও ১৫/১০৪-১০৬।

আয়াতটি মূলত মু'মিনের সফলতার মূল কর্মগুলি বর্ণনা করেছে : ঈমান, তাকওয়া, অতিরিক্ত নেক কর্ম ও জিহাদ। এই কর্মগুলিই নৈকট্য লাভ বা ওসীলা লাভের পথ। কিন্তু পরবর্তীকালে ওসীলা শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন মতভেদ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সেগুলির অন্যতম হচ্ছে : ১. দু'আর মধ্যে 'ওসীলা', ২. পীর মাশাইখের 'ওসীলা' ও ৩. উপকরণ বা মধ্যস্থতাকারী অর্থে 'ওসীলা'। এর মধ্যে 'ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শির্‌ক্‌' বিষয়টি ইতোপূর্বে শির্‌ক্‌-আসগার অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

৮.৪.১.২.১। দু'আর মধ্যে ওসীলা :

মহান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আর সময় কোন কিছুর 'দোহাই' দেওয়াকে ওসীলা বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন হাদীসে বিভিন্ন দু'আয় বলা হয়েছে : হে আল্লাহ্‌ আপনার মহান নামগুলির দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন। আমি আপনার নামগুলির দ্বারা আপনার কাছে দু'আ করছি। আমার অমুক কর্মের দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করেন . . . ইত্যাদি। তবে এ অর্থে "হে আল্লাহ্‌, অমুকের (ব্যক্তি বা বস্তু) ওসীলায়" কথাটি কোন হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি।

আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করার সময় কোন কিছুর দোহাই বা ওসীলা দেয়া কয়েকভাবে হতে পারে :

(১) মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম ও গুণাবলীর দোহাই দেওয়া
(২) নিজের কোন ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া
(৩) অন্য কারো দু'আর দোহাই দেওয়া
(৪) কারো ব্যক্তিগত মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া।

প্রথমত : দু'আয়, মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম ও গুণাবলীর দোহাই দেওয়া যেমন বলা, হে আল্লাহ্‌, আপনার রহমান নামের গুণে, বা গাফ্‌ফার নামের ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। এরূপ দোহাই দেওয়া কুরআন-হাদীসের নির্দেশ, এবং দু'আ কবুলের কারণ। মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

> "এবং সকল সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌; অতএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে।" সূরা আ'রাফ- ৭:১০৮।

দ্বিতীয়ত নিজের কোন ভাল কর্মের দোহাই দেয়া :
নিজের কোন ভাল কর্মের দোহাই বা ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, অতীত যুগের তিনজন মানুষ বিজন পথে চলতে চলতে বৃষ্টির কারণে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রবল বর্ষণে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে গুহাটি তাদের জীবন্ত কবরে পরিণত হয়। এ ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তারা দু'আ করতে মনস্থ করেন। তারা একে অপরকে বলেন, 'জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ যে আমল করেছ তদ্বারা (তার ওসীলা দিয়ে) আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর বা তার দোহাই দিয়ে আল্লাহ্কে ডাক।'

তখন তাদের একজন তার জীবনে সন্তানদের কষ্ট উপেক্ষা করে পিতামাতার খেদমতের একটি ঘটনা উল্লেখ করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার এক সুন্দরী প্রেমিকার সাথে ব্যভিচারের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র ভয়ে পাপ পরিত্যাগ করার একটি ঘটনা উল্লেখ করে এবং তৃতীয় ব্যক্তি নিজের অসুবিধা ও স্বার্থ নষ্ট করে একজন শ্রমিকের বেতন ও আমানত পরিপূর্ণভাবে আদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, "হে আল্লাহ্ আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে (ওসীলায়) পাথরটি সরিয়ে দিন।" আল্লাহ্ তাদের দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি প্রতি বার এক-তৃতীয়াংশ করে একেবারে সরে যায়। (বুখারী- ২/৮২১, ৩/১২৭৮, ৫/২২২৮, মুসলিম- ৪/২০৯৯-এ বিস্তারিত দ্রঃ।

নিজের ঈমান, মহব্বত ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়াও এ প্রকারের ওসীলা প্রদান। বিভিন্নভাবে এরূপ দু'আ করা যায়, যেমন "হে আল্লাহ্, আমি গোনাহ্গার, আমার কোন নেক আমল নেই, শুধু আপনার নবীয়ে আকরাম (সা.) এর সুন্নাতের ভালবাসাটুকু হৃদয়ে আছে, সেই ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন।" ইত্যাদি

তৃতীয়ত কারো দু'আর দোহাই দেওয়া :
কারো দু'আর ওসীলা দেওয়ার অর্থ এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ্, অমুক আমার জন্য দু'আ করেছেন, আপনি আমার বিষয়ে তাঁর দু'আ কবুল করে (সেই দু'আর ওসীলায়) আমার প্রয়োজন পুরণ করে দিন।

আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন,
"উমার (রা.) যখন অনাবৃষ্টির কবলে পড়তেন তখন আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রা.) কে দিয়ে বৃষ্টির দু'আ করাতেন, অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ্, আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর (জীবিতাবস্থায় তাঁর দু'আর) ওসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করতাম, ফলে

আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আমাদের নবী (সা.) এর চাচার (দু'আর) ওসীলায়, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা.) বলেন, তখন বৃষ্টিপাত হতো।" বুখারী- ১/৩৪২, ৩/১৩৬০।

এ হাদীসেও স্পষ্ট যে, উমার (রা.) আব্বাস (রা.) এর দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন। তাঁর কথা থেকে বুঝা যায় যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত ছিলেন, ততদিন খরা বা অনাবৃষ্টি হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কাছে দু'আ চাইতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন, এবং সেই দু'আর ওসীলায় আল্লাহ্ তাঁদের বৃষ্টি দান করতেন। তাঁর উফাতের পরে যেহেতু আর তাঁর কাছে দু'আ চাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) এর কাছে দু'আ চাচ্ছেন এবং আব্বাসের (রা.) দু'আর ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছেন।

চতুর্থত কোন ব্যক্তির, তাঁর মর্যাদার বা অধিকারের দোহাই দেয়া :

আল্লাহ্র কাছে দু'আ করার ক্ষেত্রে 'ওসীলা' বা দোহাই দেয়ার চতুর্থ পর্যায় হলো, কোন ব্যক্তির বা তাঁর মর্যাদার অথবা তাঁর অধিকারের দোহাই দেয়া। যেমন জীবিত বা মৃত কোন নবী-ওলীর নাম উল্লেখ করে বলা, 'হে আল্লাহ্, অমুকের ওসীলায়, বা অমুকের মর্যাদার ওসীলায় বা অমুকের অধিকারের ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন।'

দু-একটি দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে কিছু আলিম এরূপ দু'আ করা বৈধ বলেছেন। পক্ষান্তরে অন্য আলিমগণ কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির, তাঁর মর্যাদার বা তাঁর অধিকারের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা অবৈধ ও নাজায়েয বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, এরূপ কোন জীবিত বা মৃত কারো ব্যক্তি-সত্তার ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার কোনরূপ নযির কোন সহীহ্ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বা সাহাবী-তাবি'য়ীগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যায় না যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রিয় বা আল্লাহ্র কাছে তাঁর কোন বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার আছে। সর্বোপরি তাঁরা উপরে উল্লেখিত উমার (রা.) কর্তৃক আব্বাস (রা.) এর দু'আর ওসীলা প্রদানকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। যদি কারো দু'আর ওসীলা না দিয়ে তার সত্তার ওসীলা দেয়া জায়েয হতো তবে উমার (রা.) ও সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বাদ দিয়ে আব্বাস (রা.) এর ওসীলা পেশ করতেন না।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা শির্ক্ নয়, কারণ এতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা হয় না বা দু'আ করা হয় না; একমাত্র আল্লাহ্কেই ডাকা হয়। এ বিষয়ক বিতর্ক জায়েয-না-জায়েযের মধ্যে সীমিত। ওসীলা বিষয়ক শির্ক্ নিয়ে নীচে আলোচনা করা হলো।

৮.৪.১.২.২। পীর-মাশাইখের ওসীলার শির্ক্ :
উপরে ওসীলা বলতে যা কিছু বলা হয়েছে তা হলো কোন কিছুর বা কারো ব্যক্তিগত ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা, যা বৈধ বা অবৈধ হতে পারে, শির্ক্ নয়। ওসীলা বিষয়ক চূড়ান্ত শির্ক্ হলো, যাকে ওসীলা বলে মনে করা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাকেই সরাসরি ডাকা তথা তার কাছে ত্রাণ, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ ছাড়াও তার সাহচর্য, তার মধ্যস্থতা কিংবা তার কর্মকেও নিজের ওসীলা মনে করা এবং তিনি পরকালে ত্রাণকর্তা হিসাবে ভূমিকা পালন করবেন - এসব বিশ্বাস ওসীলা বিষয়ক শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

পীরের সাহচর্য আল্লাহ্‌র নৈকট্যের একটি ওসীলা :
এ ধারণাটি মূলত ইসলামসম্মত। কুরআন ও হাদীসে পুণ্যবান মু'মিন-মুত্তাকীদের সাহচর্য গ্রহণে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এর কারণ পুণ্যবান সৎকর্মশীল লোকের সাহচর্যে থেকে মু'মিন আল্লাহ্‌র পথে চলার প্রেরণা পাবেন, চাক্ষুষ উদাহরণ দেখে ইবাদাতের নিয়ম কানুন ও দ্বীনী শিক্ষা লাভ করবেন। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে এ রকম সাহচর্য ও আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁদেরকে ভালবাসা এক গুরুত্বপূর্ণ নেক-আমল বা ওসীলা।

তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। **প্রথমত** 'পীর' বলে কোন বিশেষ পদমর্যাদা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। বরং আলিম, নেককার, সৎকর্মশীল, ফরয ও নফল ইবাদাত পালনকারী, সুন্নাতের অনুসারী ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। পীর পরিচয়ধারী ব্যক্তির মধ্যে যদি এ সকল বাহ্যিক গুণ বিদ্যমান না থাকে তবে তার সাহচর্য গ্রহণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য নয়, বরং শয়তানের নৈকট্যের অন্যতম ওসীলা, যদিও এরূপ ব্যক্তি পীর, মুরশীদ, ওলী বা অনুরূপ কোন নাম ধারণ করে। আর যদি কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত উপযুক্ত বাহ্যিক গুণাবলী কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তিনি 'পীর' নাম ধারণ করুন আর নাই করুন তার সাহচর্য মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ওসীলা বলে গণ্য। **দ্বিতীয়ত**, মূলত মু'মিনের নিজের কর্মই তার ওসীলা, অন্য কোন মানুষ বা তার কর্ম নয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেককার মানুষের সাহচর্য গ্রহণই নেককর্ম ও ওসীলা। ইসলামী অর্থে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওসীলা হতে পারে না, কেননা কেবল মাত্র মু'মিনের নিজের কর্মই তার ওসীলা।

পীরের সাহচর্যকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা কিংবা উপকরণ মনে করা :
এটা একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা মাত্র, কেননা প্রকৃত পুণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্য অগণিত নফল-মুস্তাহাব নেক কর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যকর্ম মাত্র। তাও পুণ্যকর্ম হিসাবে পরিগণিত হবে যদি এই সাহচর্য কোন ব্যক্তির ইবাদাত পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। মূল দ্বীন হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে ঈমান ও ইসলামের ফরয্, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি আহকাম মেনে চলা। কারো সাহচর্য যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা হতো তা

হলে তো দ্বীনের মূল কর্মসমূহ পালনের প্রয়োজন থাকত না।

পীরের সাহচর্য লাভ, মুরীদ হওয়া ইত্যাদি কোন নেক আমল কবুল হওয়া বা দু'আ কবুল হওয়ার উপকরণ নয়। কারণ কুরআন হাদীসে কোথাও তা বলা হয় নি। এরূপ ধারণা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলা এবং তা পরবর্তীতে উল্লেখিত শির্‌কী বিশ্বাসগুলির পথ উন্মুক্ত করে।

(১) পীরের কর্মকে নিজের ওসীলা বলে মনে করা (শির্‌ক্ এ আকবার) :
এই বিভ্রন্তির অর্থ হচ্ছে পীরের বেলায়েতকে নিজের নাজাতের উপকরণ বলে বিশ্বাস করা। এরূপ বিশ্বাসের কারণে অনেকের ধারণা. আমার নিজের কর্ম যা-ই হোক না কেন, পীর সাহেব যেহেতু অনেক বড় ওলী, কাজেই পরকালে তিনিই আমাকে পার করিয়ে দিবেন। এরূপ বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। প্রথমত, কে বড় ওলী তা নিশ্চিত জানা তো দূরের কথা কে প্রকৃত ওলী বা কে জান্নাতী তাও নিশ্চিত জানার উপায় নেই। কে জান্নাতী এ জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, এর নির্ধারণ ও কেবল আল্লাহ্‌ই করেন। অর্থাৎ যিনি নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে বিশ্বাস করা হয়, তিনি নিজেই নাজাত পাবেন কি না তাও কারো জানার উপায় নেই, কেননা প্রত্যেকের নিজের কর্মই তার নাজাতের ওসীলা।

পীরের পীরত্বকে নিজের নাজাতের উপকরণ বলে বিশ্বাসের ভিত্তি হলো যে, মহান আল্লাহ্ কাউকে শাফা'আত করার উন্মুক্ত অনুমতি বা অধিকার দিয়েছেন বা দিবেন এবং অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত কাফির, মুশরিক, ফাসিক যাকে ইচ্ছা ত্রাণ করবেন। বস্তুত কারো সুপারিশ বা শাফা'আত আল্লাহ্ শুনবেনই, বা আল্লাহ্ তাকে ইচ্ছামত সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় শির্‌ক্ করা। এটা শির্‌ক্ এ আকবার। ('আখিরাতে বিশ্বাস' অধ্যায়ে শাফা'আত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

(২) পীরকে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী মনে করা (শির্‌ক্) :
ওসীলা বিষয়ক শির্‌কী বিশ্বাসের অন্যতম হলো, পীরকে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করা। দুভাবে এ বিশ্বাস 'প্রমাণ' করা হয় : প্রথমত কুরআনের অর্থকে বিকৃত করা এবং দ্বিতীয়ত আরবের মুশরিকদের মত 'যুক্তি' পেশ করা।

প্রথম পর্যায়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে এরা সাধারণত বলে থাকে "আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ওসীলা ধরে তাঁর কাছে যেতে, কাজেই সরাসরি তাঁকে ডাকলে হবে না। আগে ওসীলা ধরো।" এভাবে তারা কুরআনের আয়াতের অর্থকে বিকৃত করে।

বিকৃতির মূল ভিত্তি ওসীলা শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে। কুরআনের ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য, এবং ওসীলা সন্ধানের অর্থ মু'মিনের নিজের নেক আমলের মধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য সন্ধান। আর এরা বুঝাতে চায় ওসীলা অর্থ মধ্যস্থতাকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এরা যুক্তি দেয় যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশার দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ. মধ্যস্থতা বা পরিচিতি পত্র প্রয়োজন, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র দরবারেও পীর বা ওলীগণের রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোন দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেন না। বান্দা যতই ইবাদাত করুক বা আল্লাহকে ডাকুক, যতক্ষণ না তা 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে' অর্থাৎ পীরের সুপারিশসহ তাঁর দরবারে যাবে ততক্ষণ তা কবুল হবে না। অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহ্‌র দরবারে পীর ও ওলীগণ ওকালতি করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন। এ জাতীয় ধারণাগুলি সবই সুস্পষ্ট শির্‌ক্। কেননা :

(ক) এ সকল চিন্তা সবই মহান আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ্ কোথাও ঘুণাক্ষরেও বলেন নি যে, তাঁর কাছে যেতে বা দু'আ কবুল হতে কখনো কারো সুপারিশ বা মধ্যস্থতা লাগবে। বারংবার বলেছেন যে, তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে এবং বান্দা ডাকলেই তিনি শুনেন ও সাড়া দেন।

(খ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে বাইরের অপরিচিত কেউ কিছু চাইতে গেলে তার জন্য সুপারিশ দরকার হয়। বাদশাহ্‌র নিজের দরবারের পরিচিতদের বা চাকরদের কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ বা অনুমতির দরকার হয় না, কারণ তিনি তাকে ভালভাবে চেনেন। আল্লাহ্‌র সকল বান্দাই তাঁর আপনজন, এমন কেউ নেই যে, তাকে তিনি চিনেন না। কাজেই এক চাকরকে দরবারে যেতে অন্য চাকরের অনুমতি বা সুপারিশ লাগবে কেন? কোন বান্দার বিষয়ে কোন পীর বা ওলী কি মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী জানেন? মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দয়া বেশী না পীর-ওলীগণের দয়া বেশী?

বস্তুত, মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে বা মানবীয় রাজা-বাদশাহদের সাথে তুলনা করা সকল শিরকের মূল। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা ছাড়া এগুলি কিছুই নয়।

(৩) মধ্যস্থতাকারীকে উলুহিয়্যাতের হক্কদার মনে করা (শির্‌ক্ এ আকবার)

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নামে ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের ইবাদাত করা ছিল আরবের মুশরিকদের অন্যতম শির্‌ক্, যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবাদাত অর্থ চুড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। এরূপ অনুভূতি নিয়ে পীর-ওলীকে সাজদা করা, তার নাম জপ করা, বিপদে আপদে দূর থেকে তাকে ডাকা, তার কাছে ত্রাণ চাওয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ের শির্‌ক্। এ সকল বিষয়ই শির্‌ক্ আকবার।

৮.৪.১.৩। আল্লাহ্‌র হুকুম প্রদানের ক্ষমতায় শির্‌ক্ :
আমরা ইতোপূর্বে শির্‌ক্ আকবার এর ইবাদতের শির্‌ক্ অনুচ্ছেদের 'আনুগত্যের শির্‌ক্' এর বর্ণনায় দেখেছি যে, মহান আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাতের একটি দিক হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রতিপালিতদের জন্য হুকুম-আহকাম বা বিধি-বিধান প্রদান করেন। একমাত্র তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত এবং তাঁর নির্দেশই প্রকৃত হালাল বা হারাম অর্থাৎ বৈধতা ও অবৈধতা প্রদান করে। তাঁর বিধান অমান্য করার বৈধতায় বিশ্বাস, তার কোন বিধানের গ্রহণযোগ্যতায় অবিশ্বাস অথবা তিনি ছাড়া অন্য কেউ বিধান প্রদানের ক্ষমতা রাখেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি তাঁর প্রতিপালনের তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক কুফ্‌র ও শির্‌ক্। মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ পর্যায়ের শিরকের বিভিন্ন দিক রয়েছে। সেগুলির অন্যতম :

৮.৪.১.৩.১। পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা :
কোন কর্ম যদি কুরআন-হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা পাপ হিসাবে সাব্যস্ত হয় (সগীরা হোক বা কবীরা হোক) তবে সেই পাপকে হালাল বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা বা গা-সওয়া বলে অবহেলা করা কুফ্‌র। অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোন বিষয় নিয়ে উপহাস করা বা হাসি মস্করা করাও কুফ্‌র। - মোল্লা আলী কারী (র.) : শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ: ২৫৪।

এর একটি সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে, বিভিন্ন যুক্তি যেমন লভ্যাংশ, বোনাস ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সুদকে বৈধ মনে করে তা গ্রহণ করা।

৮.৪.১.৩.২। আল্লাহ্‌র নির্দেশের সমালোচনা বা উপহাস :
মহান আল্লাহ্‌র কোন নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা বা তাঁর মর্যাদার আবমাননাকর কোন বিশেষণ বা কর্ম তাঁর উপর আরোপ করা এই পর্যায়ের কুফ্‌র ও শির্‌ক্। মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ সকল কুফরের মধ্যে রয়েছে, পর্দা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, বিভিন্ন ইসলামী আইন, চুরির শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডের বিধান, তালাকের বিধান ইত্যাদি অথবা সুস্পষ্ট ও সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত শরীয়তের অন্য যে কোন বিধানকে নিয়ে উপহাস করা, তামাশা করা, এরূপ কোন বিধান অচল, অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক বা অনুপযোগী বলে মনে করা, এগুলির প্রতি অন্তরের বিরক্তি বা আপত্তি অনুভব করা, বা এগুলি ইসলামের মধ্যে না থাকলে ইসলাম আরো উন্নত ধর্ম বলে প্রমাণিত হতো বলে মনে করা। এরূপ সকল বিশ্বাস ও ধারণাই উপরে আলোচিত বিশ্বাসের মত কুফ্‌র ও শির্‌ক্।

৮.৪.১.৩.৩। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যের বৈধতায় বিশ্বাস :
আল্লাহ্‌র নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিশ্বাস সহ যদি কেউ তার ব্যতিক্রম করে বা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তবে তা পাপ বলে গণ্য হয়, কুফ্‌র বলে গণ্য হয় না।

কিন্তু এরূপ কর্মে লিপ্ত মানুষ যদি এরূপ ব্যতিক্রম করাকে বৈধ বলে মনে করে তবে তা কুফ্‌র ও শির্‌ক্ বলে গণ্য হবে। কারণ এতে মহান আল্লাহ্‌র রুবুবিয়্যাত, বিধানদান ও তাঁর বিধানের অলঙ্ঘণীয়তা অস্বীকার করা হয় এবং অন্য কারো আল্লাহ্‌র বিধানের পর্যালোচনা বা বাতিল করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। সমাজে এ পর্যায়ের শির্‌ক্-কুফরের দুটি প্রকাশ আছে :

প্রথমত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে পীর-ফকিরী মত সংশ্লিষ্ট অতিভক্তি। এরূপ মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, কোন মানুষ মহান আল্লাহ্‌র ইবাদাত বন্দেগী করতে করতে এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে, তারপর তার আর শরীয়তের বিধিবিধান পালন করা জরুরী থাকে না এবং তার জন্য শরীয়ত লঙ্ঘন করা বৈধ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে কুফ্‌র ও শির্‌ক্। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী যদি নিজে শরীয়ত পালন করেন তবুও তিনি কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য হবেন। অনুরূপভাবে কোন লোক পীর-ফকীর পরিচয় দিয়ে নিজেকে শরীয়তের বিধানের ঊর্ধ্বে বলে দাবী করে সে তো আরো জঘন্যতর কাফির ও মুশরিক।

আমরা দেখেছি যে, সমাজে শির্‌ক্ প্রসারের অন্যতম কারণ কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবন ধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং পরবর্তী যুগের আওলীয়াগণের নামে প্রচলিত অগণিত সত্য-মিথ্যা, বানোয়াট ও আজগুবি কাহিনীর প্রাদুর্ভাব। এ সকল গল্প-কাহিনীকে 'দলীল' হিসাবে প্রচার করে এ জাতীয় শির্‌ক্ বিশ্বাসকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক শিক্ষিত অথচ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষদের ইসলামী আইন বিষয়ক ভ্রান্ত অনুভূতি। অনেক শিক্ষিত মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও এবং ইসলামের কিছু বিধান পালন করা সত্ত্বেও ইসলামী বিধি বিধান, এগুলির নৈতিক মূল্য, বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের গত হাজার বছরের মিথ্যা প্রচারণার কারণে অনেক সময় ইসলামের কোন কোন বিধানকে সময়ের জন্য অনুপযোগী অথবা নিষ্ঠুর কিংবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করেন, অথবা অন্য ধর্ম বা সমাজের প্রচলিত বিধানকে উত্তম মনে করেন। এরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে যদি আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যতিক্রম বিচার ফায়সালা প্রদানকে বৈধ এবং কোন অপরাধ নয় বলে মনে করেন তবে তা স্পষ্ট কুফ্‌র ও শির্‌ক্। মহান আল্লাহ্ বলেন,

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" সূরা মায়িদা- ৫:৪৪।

তবে কেউ যদি ব্যক্তিগত দুর্বলতা, লোভ, অসহায়ত্ব, অজ্ঞতা বা অনুরূপ কোন কারণে আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করেন বা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে বিধান বা ফয়সালা প্রদান করেন তবে তা পাপ (কুফরে আসগার) বলে গণ্য, কুফ্‌র বা শির্‌ক্ নয়।

এর কারণ তিনি আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যতিক্রম করাকে বৈধ মনে করেন না, বরং এটা পাপ ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। অপর পক্ষে যদি সে উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার সাধ্যমত বিধান সম্পর্কে জানার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে সে ভুল করে তবে সে ক্ষেত্রে সে ভুলকারী বলে বিবেচিত হবে। সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করার কারণে সাওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে এবং তার ভুলের অপরাধের জন্য ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে।

৮.৪.২। ইবাদতের শির্‌ক্

রুবূবিয়্যাতের শির্‌ক্ থেকেই ইবাদতের শিরকের উৎপত্তি। কারো মধ্যে 'অলৌকিক' ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করলেই তার প্রতি 'অলৌকিক' ভক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা জন্ম নেয়। ইতোপূর্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে শির্‌কী কর্মগুলির বর্ণনায় আমরা ইবাদতের শিরকের প্রকারগুলি দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, সাজদা, কুরবানী, উৎসর্গ, জবাই, মানত, দু'আ, ডাকা, ত্রাণ প্রার্থনা করা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ভালবাসা, আনুগত্য, যিয়ারত, তাবাররুক ইত্যাদি বিষয় শিরকের মূল। আমাদের সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিছু শিরকের বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৮.৪.২.১. গাইরুল্লাহ্‌কে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা

আমরা দেখেছি যে, অলৌকিক ত্রাণ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যায় না। দূরে অবস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে লৌকিক বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া শির্‌ক্।

হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ্ পিতামাতার দু'আ কবুল করেন এবং আরো জানি যে, তিনি তাঁর নেককার প্রিয় বান্দাদের বা ওলীদের দু'আ কবুল করেন। দুটি বিষয়ই হাদীসে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কখনোই আমরা দেখব না যে, কোনো মানুষ তার পিতামাতার কাছে দু'আর জন্য চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে একজন 'ওলী'র সামনে বা তার মাজারের সামনে সে 'চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব' প্রকাশ করছে। এর কারণ সে তার পিতামাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জানে যে, পিতামাতার দু'আ আল্লাহ্ কবুল করেন, তবে করা না করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আর 'ওলী'র ক্ষেত্রে তার ধারণা যে তাঁর দু'আ কবুল করা আর সেভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন নেই, বরং তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ্ তাঁকে এত ভালবাসেন যে, তাঁর দু'আ তিনি ফেলতে পারবেন না . . . ইত্যাদি। আর এরূপ ধারণাই শিরকের উৎস।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী তাঁর 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে বলেন,
"কবর পূজারীদেরকে পীর পুরস্ত বা পীর পূজারীও বলা হয়। কবর পূজারী সম্প্রদায় কবর পূজাকে ফরয্ ইবাদাত তথা নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ

মনে করে। সুন্নাত ইবাদাতের চাইতে কবর পূজাকে তারা অধিক ফযীলতপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ বলে মনে করে। তাই তারা কবর পূজাকে যে কোন ইবাদাতের পরিবর্তে করে থাকে এবং এটাকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত তারা কিন্তু কবর পূজার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কোন ইবাদাতকে গুরুত্ব দেয় না এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতকে যথেষ্ট মনে করে না। যখন কোন বুযুর্গের উরশ বা মেলা ইত্যাদি হয় তখন সেখানে বহু দূর দূরান্ত থেকে বহু লোকের সমাগম হয়। এই ক্ষেত্রে কবর পূজারীরা সেই মেলায় উপস্থিত হওয়া ফরয ইবাদাত মনে করে এবং অন্যান্য ফরয ইবাদাতের সাওয়াব অর্জন করার চেয়ে এটাকেই অধিক প্রয়োজন মনে করে থাকে।"

"কবর পূজারীদের আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জঘন্যতম কাজ হলো, যাবতীয় পার্থিব বিপদাপদ ও সঙ্কটময় কাজের সমাধান হওয়ার জন্য কবরের নিকট গিয়ে এমন বিনয়, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে কান্নাকাটি করে যে, মসজিদে বা অন্য কোথাও আল্লাহকে হাযির নাযির মনে করে এর শতভাগের একভাগও করে না। কবরে শায়িত বুযুর্গের নাম ধরে তাকে ডাকে এবং দু'আ করে এবং তার নিকট জীবিকা ও সন্তানাদি কামনা করে। হিন্দু ও অন্যান্য মুশরিক সম্প্রদায় তাদের প্রতিমার জন্য যেভাবে অর্চনা করে থাকে ঠিক সেভাবেই এই কবর পূজারীগণও কবরকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা ও কবরের সামনে মাথা নত করে বিনয় দেখানোকে পুণ্যময় মনে করে সম্পাদন করে থাকে।" শাহ ওয়ালী উল্লাহ - আল-বালাগুল মুবীন (বঙ্গানুবাদ) পৃষ্টা- ১৮।

এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ আরো বলেন,
". . . কবর পূজারী সম্প্রদায় তাদের কুকর্মের সমর্থনে যে সমস্ত অলীক ও মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে থাকে তা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। যেমন তারা বলে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়ে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ে। মুক্তির কোন পথ দেখতে না পেয়ে অমুক দরবেশের মাজারে গিয়ে বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। কি আশ্চর্য! সেই দরবেশ দুই-একদিনের মধ্যে তার সমস্ত বিপদাপদ দূর করে দেয়। এমনকি কেউ কেউ নিজের কথাও বলে থাকে যে, আমি অমুক বিপদে পড়ে শেষ চেষ্টা স্বরূপ অমুক পীরের মাজারে নযর-নেওয়াজ নিয়ে যাওয়ায় পীর তার সকল বিপদ দূর করে দেয় . . . ।" নাউযুবিল্লাহ্!

৮.৪.২.২ গাইরুল্লাহর জন্য সাজদা

ইবাদাতের শির্‌ক্ অধ্যায়ে (৬.২.২.) আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে সুস্পষ্টত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল আলিম একমত যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা করাই শির্‌ক্।

এ বিষয়ে শির্ক্ অধ্যায়ে একাধিক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি আলোচনা করে আল্লামা কুরতুবী বলেন,

"এ সকল হাদীসে যে সাজদা নিষেধ করা হয়েছে সে সাজদা জাহিল সূফীগণ তাদের রীতিতে পরিণত করেছে তাদের সামার মাজলিসে এবং তাদের পীর-মাশাইখের নিকট প্রবেশের সময় এবং তাদের দু'আ-ইসতিগফারের সময়ে। তাদের মুর্খতার কারণেই তা তারা করে। তাদের কর্ম বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তাদের আশা বিনষ্ট হয়েছে।" কুরতুবী, জামী লি আহকামিল কুরআন ১/২৯৪।

৮.৪.২.৩। গাইরুল্লাহ্র জন্য মানত-নযর বা উৎসর্গ (কবর পূজা) :

শির্ক্ অধ্যায়ে আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য, যেমন জীবিত বা মৃত কোন পীরের নামে, মানত, উৎসর্গ, জবাই, কুরবানী ইত্যাদি শির্ক্। আর মুসলিম সমাজে বিশেষত আমাদের উপমহাদেশে এই শির্ক্ ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে।

আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী (১২৫২ হি:) 'হাশিয়াতু রাদ্দিন মুহতার' গ্রন্থে (২/৪৩৯) বলেন,

"আওলীয়া কেরামের মাযারে তাদের নৈকট্য বা নেক-নযর লাভের জন্য মানত করার ধরন এই যে, মানতকারী বলে, হে অমুক হুজুর বা হে অমুক বাবা, যদি আমার হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে বা আমার অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় অথবা আমার হাজত পূর্ণ হয় তবে তোমার জন্য এত পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, মোমবাতি বা তেল দেব। এ প্রকারের মানত বাতিল ও হারাম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে :

প্রথমত, এভাবে মাখলুক বা সৃষ্টির জন্য নযর-মানত করা হয়, অথচ কোন সৃষ্টির জন্য মানত-নযর জায়েয নয়। কারণ মানত-নযর হচ্ছে ইবাদাত এবং কোন মাখলুক বা সৃষ্টির ইবাদাত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, যার মানত করা হচ্ছে তিনি মৃত। আর মৃত ব্যক্তি কোন মালিকানা লাভ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, এরূপ মানতকারী ধারণা করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া মৃত মানুষও কাজে কর্মে বা দুনিয়া পরিচালনায় কিছু করতে পারেন, আর তার এ আকীদা কুফ্র।"

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি:) 'আল-বাহরুর বায়িক' (২/৫২০) গ্রন্থেও একই কথা বলেছেন।

যারা কবরে, মাযারে আওলিয়ায়ে কেরামের নামে মানত বা জবাই করেন তাদের অনেকে মনে করেন যে, আমরা তো একমাত্র আল্লাহ্র নাম নিয়েই জবাই করছি এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই মানত করছি, কেবলমাত্র পশুটাকে বাবার বা ওলীর মাযারে এনে জবাই করছি,

যেন তিনি সওয়াব পান। এখানে প্রশ্ন হলো, যদি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই জবাই বা মানত করা হয় তা হলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে জবাই করেই তো নিয়্যাত করা যেত যে আল্লাহ্ এই সাদাকার সাওয়াবটি অমুককে পৌঁছে দিন, এত কষ্ট করে মাযারে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? মাযার ময়লা করতে?

বাহ্যত এ কষ্টের কারণ হলো পৃথিবীর যে কোন স্থানে জবাই করলে তো আল্লাহ্ পাবেন, কবরস্থ ওলী বা বাবা সারাসরি পাবেন না, আল্লাহ্‌র মাধ্যমে পাবেন। আর মাযারে নিয়ে জবাই করলে এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিও প্রকাশ হবে আর কবরস্থ 'বাবার' প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করা হবে। যদিও দ্বিতীয়টিই মূল উদ্দেশ্য এবং সে জন্যই এত কষ্ট করা, তবে আল্লাহকে শরীক রাখলে অসুবিধা নেই, এতে 'বাবা' নারায হবেন না!

এ প্রসংঙ্গে আল্লামা আলূসী বলেন, " . . . একমাত্র আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যদি তারা জবাই করত এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই মানত করত তবে তারা এরূপ মানতের মাধ্যমে ওলীগণের নিকট থেকে তাদের অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থতা, তাদের হারানো মানুষের প্রত্যাবর্তন বা অনুরূপ কোন হাজত প্রার্থনা করত না। এর প্রমাণ এই যে, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য মানত কর এবং এর সাওয়াব তোমাদের পিতামাতার জন্য দান কর, কারণ এ সকল ওলী আওলিয়ার চেয়ে তোমাদের পিতামাতাগণেরই সাওয়াবের প্রয়োজন বেশী তবে তারা তা করবে না। আমি এদের অনেককে দেখেছি যে, তারা ওলীগণের কবরের পাথরের বেদীমূলে সাজদা করছে।"

"এদের অনেকে দাবী করে যে, সকল ওলীই তাদের কবরে বসে দুনিয়া পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন, তবে তাদের বেলায়েতের স্তর অনুসারে তাদের ক্ষমতার কমবেশী রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বিশ্ব পরিচালনার এরূপ ক্ষমতা ৪ বা ৫ জন কবরবাসীর জন্য সীমাবদ্ধ করেন। তাদের কাছে যদি প্রমাণ চাওয়া হয় তবে তারা বলেন, কাশফ দ্বারা তা প্রমাণিত! মহান আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা কত বড় জাহিল!! আর এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াত কত ব্যাপক!!!" আলূসী- রূহুল মা'আনী- ১৩/১৫৫।

৮.৪.২.৪। গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ

কোনো কিছুর চারদিকে আবর্তন করাকে তাওয়াফ বলা হয়। সাজদা ও সালাতের মতই তাওয়াফ একটি ইবাদত। সালাত-সাজদা ও তাওয়াফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশ্বের যে কোনো স্থানে থেকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে আল্লাহ্‌র জন্য সালাত ও সাজদার ইবাদত আদায় করা যায়। পক্ষান্তরে আবর্তন বা তাওয়াফের ইবাদত একমাত্র কাবা গৃহের চারদিকে আবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র জন্য এ ইবাদত পালন করা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন: "এবং তারা তাওয়াফ করুক প্রাচীন গৃহের।" সূরা হাজ্জ, আয়াত ২২:২৮।

আল্লাহ্‌র ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হলেও কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোন কিছুর তাওয়াফ করা কঠিন হারাম ও নিষিদ্ধ। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য কোথাও তাওয়াফ করা সুস্পষ্ট শির্‌ক্।

যারা কোন কবর, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা অন্য কিছুর তাওয়াফ করেন তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা বললেও পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাঁর নেক-নজর লাভেরও উদ্দেশ্য তাদের থাকে। নইলে কাবা ঘর বাদ দিয়ে অন্যত্র তাওয়াফ করবেন কেন?

৮.৪.২.৫। তাবার্‌রুক বিষয়ক শির্‌ক্ :

কোন বস্তুকে, বিশেষত পুণ্যবান কোন মানুষের স্মৃতি-বিজড়িত কোন দ্রব্য বা স্থানকে বরকতের উৎস বলে মনে করে সেটির সামনে চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের মালিকের আত্মা থেকে কোন নেক নযর আশা করাকে তাবার্‌রুকের শির্‌ক্ বলা হয়। এ যুগে মুসলিমদের মধ্যে এই প্রকারের শির্‌ক্‌ও ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন পুণ্যবান মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে কেবল স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শির্‌ক্ নয়। এ ক্ষেত্রে সম্মান দেখানোর পদ্ধতি সুন্নাহ্ সম্মত হতে হবে।

তাবার্‌রুকের সুন্নাত পদ্ধতি : এ বিষয়ে আমরা জানতে পারি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীবর্গের কর্ম থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সবচেয়ে মূল্যবান ও বরকতময় স্মৃতি ছিল কাবা ঘর ও তৎসংশ্লিষ্ট হাজ্‌র আসওয়াদ, রুকন ইয়ামানী, মাকাম ইবরাহীম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাজ্‌র আসওয়াদে চুম্বন করেছেন। এ চুম্বন আল্লাহর নির্দেশ ও ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ-অনুকরণের চুম্বন; পাথর থেকে বা পাথরের কারণে ইবরাহীম (আ.) থেকে কোন বরকত, দু'আ কল্যাণ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য নয়। সাহাবীগণও কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ও সুন্নাত পালনের জন্যই তা চুম্বন করেছেন, পাথর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। উমার (রা.) হাজ্‌র আসওয়াদ চুম্বনকালে বলেন, "আমি জানি যে, তুমি পাথর মাত্র, কোন ক্ষতিও করতে পার না, কোন উপকারও করতে পার না। যদি না আমি দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাকে চুম্বন করেছেন, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।" বুখারী, ২/৫৭৯, মুসলিম- ২/৯২৫।

সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর দেখেন যে, তাবি'য়ী যুগের কিছু নওমুসলিম মাকামে ইবরাহীমে হাত বুলাচ্ছেন। তাঁরা এভাবে বরকতময় স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্যটিকে সম্মান করছিলেন। তখন তিনি বলেন,

"তোমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেয়া হয় নি, কেবলমাত্র (এর পেছনে) সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" ইবনু আবী শাইবা, আল মুসান্নাফ ৩/৪১৬।

অন্য হাদীসে নাফে' (র.) বলেন, "কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় 'বাই'আতে রিদওয়ানের গাছ নামে কথিত গাছটির নিকট আসত এবং সেখানে সালাত আদায় করত। খলীফা উমার (রা.) এ কথা জানতে পেরে তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। পরে ঐ গাছটিকে তিনি কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশমত গাছটি কেটে ফেলা হয়।" ইবনু হাজার ফাতহুল বারী- ৭/৪৪৮।

সাহাবীগণ পবিত্র কা'বা ঘরের সুন্নাত নির্দেশিত স্থানগুলি তথা হাজ্‌র আসওয়াদ ও রুকন ইয়ামানী ছাড়া তথাকার অন্য কোন স্থান চুম্বন, হাত বুলানো বা অন্য কোনভাবে 'তাবার্‌রুকের' চেষ্টা কখনো করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণ তাঁর ওযুর পানি, থুথু, গায়ের ঘাম, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা তাঁর দেয়া যে কোন উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের এ সকল কাজে বাধা দেন নি, অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবি'য়ী, তাবি'-তাবি'য়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুযুর্গ ও রাসূল প্রেমিক মুসলিম রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) স্মৃতি বিজড়িত যে কোন দ্রব্যের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসা গোপন করেন নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পরে সাহাবীগণ, তাবি'য়ীগণ বা তাবি'-তাবি'য়ীনগণ খুলাফায়ে রাশেদীনের, কোন সাহাবীর বা অন্য কোন বুযুর্গের বা পূর্ববর্তী কোন নবী-ওলীর স্মৃতি বিজড়িত কোন দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ বা সংরক্ষণ করেন নি। এ ধরণের আচরণ কেবল রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য ও স্থান এর জন্য বিশেষ ছিল। স্থানের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল, তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে বিশ্রাম করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা। এমনিভাবে যেখানে তিনি ফরয সালাত আদায় করেছেন সেখানে তারা নফল সালাত আদায় করতেন না। এমনকি তিনি হজ্জ-উমরার সফরে যেখানে সালাত আদায় করেছেন, সেখানে তাঁরা হজ্জ-উমরার সফরেই শুধু সালাত আদায় করতেন, অন্য সময়ে শুধু সালাত আদায়ের জন্য সেখানে যেতেন না। অর্থাৎ সাহাবীগণ তাবাররুক করতেন হুবহু অনুকরণের মাধ্যমে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র.) বলেন, "এই যুগে যদি এ সকল লোক কোন পীরের লাঠি, পাগড়ী, পাদুকা, তাসবীহ, জামা কাপড় বা অন্যান্য ব্যবহৃত কিছু পায় তবে তা অতি সম্মানের সাথে কোন উঁচুস্থানে সংস্থাপন করে সেই স্থানটিকে যিয়ারত করার জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেটিকে 'দরগাহ শরীফে' পরিণত করে। লোকজন এইসব স্থান ও বস্তুকে নিজেদের কিবলাহ, মাকসুদ ও মনের আশা-আকাংখা পূর্ণ হওয়ার একমাত্র উৎস মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে সেখানে এসে হাজির হয়। নযর দেয়া, মিষ্টান্ন বিতরণ করা, সুগন্ধি ছড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বুযুর্গদের আত্মার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে, এবং বুযুর্গদের জিনিষগুলিকেই ঐ বুযুর্গের স্থলাভিষিক্ত মনে করে।"

. . . এ সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে দরগাহর কোন কোন লোক প্রোপাগাণ্ডা করে বলে থাকে, 'আমি অমুক বুযুর্গের ব্যবহৃত পাদুকার বরকতে এমন উপকার পেয়েছি যা বর্তমান যুগের জীবিত বুযুর্গদের নিকটও পাওয়া যায় না . . . ।'

"এই কপটতা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, জ্ঞানী 'আলিমগণ যখন তাদেরকে এ জাতীয় শরীয়ত বিরোধী অন্যায় কাজ করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন তখন তারা নানা প্রকার ওজর আপত্তি, টালবাহানা ও বুযুর্গদের প্রতি মহব্বত পোষণের বাহানা অনুসন্ধান করে বলে থাকে - 'এ জাতীয় কথা আমরা তাদের প্রতি মহব্বতের দরুণই বলে থাকি।' পরে যখন এই কপটতার রোগ সীমা অতিক্রম করে যায় তখন এই জাতীয় লোকেরা প্রকাশ্য শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়। যারা তাদেরকে এসব কাজে বাধা দান করে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বলতে থাকে, 'এরা আল্লাহর ওলীদের মত ও পথের বিরোধী, তারা কাশফ কেরামত অস্বীকার করে। . . . তারা ওলীদের শত্রু। . . . ।" শাহ ওয়ালীউল্লাহ আল-বালাগুল মুবীন, পৃ: ৩৭-৪০।

৮.৪.২.৬। প্রচলিত তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শির্ক্ :

তাওয়াক্কুলের শির্ক্ :

আমরা জেনেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপর 'অলৌকিকভাবে' নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা শির্ক্। এ জাতীয় শির্ক্ এখনো এ দেশের অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক। যেমন কোন কর্ম শুরু করার সময়, যাত্রার সময় বা নৌকা চালানোর সময় আল্লাহর নামের সাথে গাজী পীর, পাঁচ পীর, খোয়াজ খিজির, বদর পীর বা অনুরূপ কোন সত্য বা কল্পিত পীর বা ওলীর নাম নেওয়া। অনুরূপভাবে মা, বাবা, খাজা বাবা, পাক পাঞ্জাতন বা অন্য কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, বা যাত্রার শুরুতে বা কোন কাজের শুরুতে এরূপ কারো নাম স্মরণ করে কপালে হাত দিয়ে সালাম করে বা মাথা নুইয়ে তার প্রতি সালাম জানিয়ে কাজ শুরু করা, কাজের শুরুতে যন্ত্র, কাস্তে বা অন্য কোন উপকরণকে কপালে ঠেকানো বা সালাম করা, ফাতিমা (রা.) কে বরকতের মালিক মনে করে ওজন করার সময় তাঁর নাম নিয়ে বা 'মা বরকত' নাম নিয়ে শুরু করা, প্রথম ফল, ফসল, দুধ ইত্যাদি মানিক পীর বা কারো নামে ফেলে দেয়া এবং এভাবে তাদের সাহায্যের আশা করা . . . ইত্যাদি অগণিত শির্কী কর্ম ও বিশ্বাস সমাজের আনাচে কানাচে এখনো বিদ্যমান। বস্তুত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অভাব, পূর্ববর্তী ও পার্শ্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, মানবীয় দুর্বলতা ও অনুকরণপ্রিয়তা, আলিমগণের অসতর্কতা, স্বার্থান্বেষীদের লোভ ও অপপ্রচার, শয়তানের প্ররোচনা ও প্রতারণা ইত্যাদি কারণে এভাবে সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলিমগণ শিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

আনুগত্যের শির্ক্ :

আনুগত্য বিষয়ক শির্ক্ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী, "তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের

পণ্ডিতগণকে এবং সংসার বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে . . . " (৯:৩১) - এ আয়াত উল্লেখ করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী তার 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে (পৃঃ ২৭, বঙ্গানুবাদ) বলেন, "উল্লেখিত আয়াতে শির্ক্‌কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সংশ্লিস্ট করা সত্ত্বেও অন্য কোন সম্প্রদায় ঐ সমস্ত কাজ করলে তাদের জন্যও তা শির্ক্ হবে এবং তারা মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে। বর্তমান যুগে কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক বলে বেড়ায়, 'পীর-ফকীরগণ যা আদেশ করে তা বিনা দ্বিধায় মেনে চলা ওয়াজিব। তাদের আদেশ নিষেধ যদি শরীয়ত বিরোধীও হয় এবং শরীয়ত যদি তা প্রত্যাখ্যানও করে তথাপি আমাদের পক্ষে তা পালন করা কর্তব্য।' তাদের উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে তারা হাফিজ শিরাজীর একটি রূপক কবিতা প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করায়। কবি হাফিজ বলেছেন, 'পীরে কামেল যদি তোমার জায়নামাযকে শরাব দিয়ে রঙ্গীন করার আদেশ দেন তবে তোমার পক্ষে তা কার্যকরী করা প্রয়োজন। কারণ পথ প্রদর্শক কখনো পথ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন না।' ফলে এরাও 'আরবাবাম-মিন-দুনিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্তকারীদের ন্যায় শিরকের তমসায় তমসাচ্ছাদিত।"

শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ আরো বলেন, "সাধারণ কোন মানুষ যদি কোন একজন ফকীহ্‌কে এ কথা ভেবে তাকলীদ বা অনুসরণ করে যে, তাঁর মত মানুষের কোন ভুল হতে পারে না এবং তিনি যা বলবেন তা অবশ্যই সঠিক এবং তার মনের মধ্যে এরূপ চিন্তা করে যে, উক্ত আলিমের মতের বিরুদ্ধে দলিল প্রকাশ পেলেও তার অনুসরণ ত্যাগ করব না, তবে তা হবে পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রাব্ব-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করা (শির্ক্)। . . . " শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৪৪৬-৪৪৭।

ভালবাসার শির্ক্ :

মুশরিকদের ভালবাসার শির্ক্ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

> "একমাত্র আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়, কিন্তু যখন তাঁকে ছাড়া অন্যান্য (উপাস্য)-দের কথা উল্লেখ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।" সূরা যুমার- ৩৯:৪৬।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী বলেন : "মহান আল্লাহ্ এখানে মুশরিকদের যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন সে অবস্থায় আমরা (মুসলিমদের মধ্যে) অনেক মানুষকে দেখতে পাই। এ সকল মানুষ যে সকল মৃত ব্যক্তির নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করে ও সাহায্য চায় তাদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা উৎফুল্ল উল্লসিত হয়। তাদের নামে মিথ্যা কাহিনীগুলো শুনলে তারা উল্লাসে উদ্বেলিত হয়। এ সকল কাহিনী তাদের মর্জি ও পছন্দমত হয় এবং তাদের আকীদার পক্ষে হয় বলেই তারা এরূপ উল্লসিত হয়। যারা এরূপ কাহিনী বর্ণনা করে তাদেরকে তারা খুবই মর্যাদা দেয় এবং ভক্তি করে। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কথা উল্লেখ করে, এবং বলে একমাত্র তিনিই সকল কার্য পরিচালনা করেন, তিনিই সকল

ক্ষমতার মালিক, এবং তাঁর মহত্ব ও মর্যাদার পরিচায়ক প্রমাণগুলি উল্লেখ করে, সেই ব্যক্তির প্রতি তারা বিতৃষ্ণা বোধ করে এবং তার থেকে দূরে অবস্থান করে।" আলূসী, রুহুল মা'আনী ১৭/৪৮৬-৪৮৭।

৮.৫। শিরকের সেকাল ও একাল :

শির্ক্ বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী মুশরিকদের শিরকের সাথে মুসলিম সমাজের শীয়াগণ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত বা অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত শিরকে লিপ্ত মানুষদের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মের মধ্যে আমরা অদ্ভুত মিল দেখতে পাই :

সকলেরই শির্কের ভিত্তি এই যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর কিছু বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তাঁদেরকে কিছু অলৌকিক মঙ্গল অমঙ্গলের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাঁদের সুপারিশ তিনি ফেলবেন না। এরূপ বান্দাদেরকে তাঁদের মৃত্যুর পর ডাকলে তাঁরা তা শুনতে ও জানতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতায় বা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এদের ডাকলে আল্লাহ্ খুশী হন এবং এদের ডাকলে এরা বান্দাকে আল্লাহ্র বেলায়েত বা নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করার বৈধতা তখনই প্রমানিত হতো যদি আল্লাহ্ নিজে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন যে, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় লোকদের ইবাদাত করো, তারা তোমাদের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবে। কিন্তু মুশরিকরা এরকম কোন দলীল বা প্রমাণ দেখাতে পারেনি। মুসলিম সমাজের যে সকল মানুষ শিরকে লিপ্ত তাদের অবস্থাও একই। তারা কখনোই কুরআন-হাদীস থেকে একটি নির্দেশনাও দেখাতে পারে না যে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকতে, সাহায্য চাইতে, সাজাদা করতে, অন্য কারো নামে মানত, উৎসর্গ করতে বা অন্য কাউকে ইবাদাত করতে কোনরূপ নির্দেশনা দিয়েছেন। কিছু বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, যুক্তি, কল্পনা বা গল্প-কাহিনীই তাদের সম্বল।

তা'বীল-ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ অমান্য করানো হলো ইবলিসের প্রতারণার মূল সূত্র। শয়তান আদম ও হাওয়াকে (আ.) আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করতে বলে নি বা এ কথাও বলে নি যে আল্লাহ্র আদেশ মানার দরকার নেই, বরং কৌশলে তাঁদেরকে প্রতারণায় ফেলে এভাবে, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি বিশেষ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে

পার।' পাশাপাশি সে আল্লাহ্‌র কসম করে বলল যে, তাঁদের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্খী হিসাবে কেবল মাত্র তাঁদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে! (সূরা আ'রাফ-৭:২০-২১)।

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করেছে। মহান আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন, জানেন, শুনেন। তিনি প্রদান করলে কেউ ঠেকাতে পারে না, এবং তিনি ঠেকালে কেউ দিতে পারে না। সকল বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকে ডাকতে তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন শয়তান বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলছে, অমুক-তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কবর সংক্রান্ত যত কাজ করতে নিষেধ করেছেন, এখন শয়তান নতুন ব্যাখ্যা তৈরী করে বলছে অমুক কারণে তা নিষেধ, কিন্তু তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। সকল শির্‌ক্, কুফ্‌র ও বিদ'আতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই। মু'মিনকে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ নির্দ্বিধায় আক্ষরিকভাবে পালন করতে হবে, এটাই নাজাতের পথ।

৮.৬। কুফ্‌র বনাম তাকফীর :

তাকফীর এর অর্থ ঈমানের দাবীদার বা মুসলিম বলে দাবীকারী কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা করা বা কাফির বলে অভিযুক্ত করা। আমরা দেখেছি যে, সমাজের অনেক মানুষই নিজেকে মু'মিন ও তাওহীদে বিশ্বাসী বলে দাবী করার পরেও উপরে আলোচিত বিভিন্ন প্রকার শির্‌ক্ বা কুফরের মধ্যে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু এদের এ সকল কর্ম শির্‌ক্ বা কুফ্‌র বলে আমরা নিশ্চিত জানার পরেও এদেরকে কাফির বা মুশরিক হিসাবে সরাসরি ঘোষণা দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ইসলামের নির্দেশ। কারণ কোন কর্মকে কুফ্‌র বা শির্‌ক্ বলা এবং কোন ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

৮.৬.১। ঈমানের দাবীদার কাউকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা :

কাউকে কাফির বলার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যেমন কবীরা গুনাহ বা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কারণে কাফির বলা, সুস্পষ্ট কুফ্‌রী কর্মের কারণে কাফির বলা, অস্পষ্ট কুফ্‌রীর কারণে কাফির বলা, কাল্পনিক কুফ্‌রীর কারণে কাফির বলা ইত্যাদি।

ইমানের দাবীদারকে কাফির বলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উম্মাতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দুজনের মধ্যে একজনের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির না হয় তবে যে তাকে কাফির বলল তার

উপরেই কুফ্‌রী প্রযোজ্য হবে।" বুখারী- ৫/২২৬৩, মুসলিম- ১/৭৯। (একই অর্থে বিভিন্ন সনদে আরো একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস আছে যেমন - বুখারী- ৫/২২৬৪, ইবনু হিব্বান- ১/৪৮৩ ইত্যাদি)।

অন্য এক হাদীসে সাবিত ইবনু দাহ্‌হাক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ কোন মু'মিনকে কুফ্‌রীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ হবে।" বুখারী- ৫/২২৪৭।

৮.৬.২। তাকফীরের মূল নীতি :

উপরের হাদীসসমূহের নির্দেশনার আলোকে এটা স্পষ্ট যে, একজন মু'মিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন, সকল কুফ্‌র, শির্‌ক্, পাপ ও ইসলাম বিরোধী চিন্তা চেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন, কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবী গ্রহণ করার ব্যাপারে বাহ্যিক দাবীর উপর নির্ভর করবেন। ভুল করে কোন মু'মিনকে কাফির বলে মনে করার চাইতে ভুল করে কোন কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা অনেক অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এই নীতির ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করছেন, তাকে কোন পাপের কারণে অমুসলিম কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তওবা করুন বা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী বা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন, কিংবা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন তবে তা কুফ্‌রী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে। ঈমানের দাবীদার কোন ব্যক্তি জেনে শুনে কুফ্‌রী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে। তথাপি তিনি যদি সুস্পষ্ট কোন কুফ্‌রী বা শির্‌কী কাজে লিপ্ত হন, তবে তার কর্মকে কুফ্‌রী বলা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোন ওজর আছে কি না তা জানতে হবে। সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য কোন ওযরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার বিষয়ে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত আলিম বিচারকগণের সামনে তাকে হাজির করতে হবে এবং তারাই কুফ্‌রীতে জড়িত ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য কি না, বা সে ভুল স্বীকার করে সঠিক পথে ফিরে আসতে রাজী কি না তা যাচাই করে দেখবেন। তার

যদি কোন ওজর না থাকে, কিংবা কুফ্‌রী ও শির্‌কীতে সে অটল থাকে তবেই বিচারকগণ তাকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা দেবেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র তার ব্যাপারে যথাযথ বিচারিক পদক্ষেপ নিবেন।

এখানে গ্রহণযোগ্য উদাহরণ হিসাবে ওযরের একাধিক হাদীসের উল্লেখ করা যায় :

মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন, কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যাদি গোপন রাখেন। সাহাবী হাতিব (রা.) বুঝতে পারেন যে এটি মক্কার বিরুদ্ধে হবে, তাই তিনি তাঁর আপনজনদের নিরাপত্তার কথা ভেবে মক্কার কাফিরদেরকে একটি চিঠি দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওহী মারফত এ বিষয় জেনে যান এবং আলী (রা.) সহ তিনজন সাহাবীকে পাঠিয়ে এক মহিলার কাছে থেকে চিঠিটি উদ্ধার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কৈফিয়ত চাইলে হাতিব (রা.) বলেন যে, তিনি কেবল পরিবারের কথা ভেবে চিঠি দিয়েছিলেন, কুফ্‌রী, ধর্মত্যাগী বা কুফ্‌রীতে সন্তুষ্টির কারণে তিনি এ কাজ করেন নি। তখন উমার (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী হাতিবের ওজর সত্য বলে মেনে নেন। (বুখারী- ৩/১০৯৫, মুসলিম- ৪/১৯৪১, সংক্ষেপিত)।

অন্য একটি হাদীসে আছে, মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যকার কয়েকজন নও মুসলিম মুশরিকদের 'যাতু আনওয়াদ' গাছের মত তাদের জন্যও একটি গাছ বরকতের জন্য নির্ধারণ করে দিতে বলেন। 'যাতু আনওয়াদ' গাছকে বরকতময় মনে করে মুশরিকরা যুদ্ধে যেতে সেটির কাছে ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। এ কাজটি শির্‌ক্, তথাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানতেন যে অজ্ঞতার কারণেই নও মুসলিমরা এ অনুরোধ করেছিল। তিনি তাদেরকে কেবল ভর্ৎসনা করলেন। (তিরমিযী- ৪/৪৭৫, সংক্ষেপিত)।

অপর একটি হাদীসে আছে, আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "এক ব্যক্তি জীবনভর সীমা লঙ্ঘন ও পাপে লিপ্ত থাকে। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলে : আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পোড়াবে। এর পর আমাকে বিচুর্ণ করবে। এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমুদ্রে ছড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহ্‌র কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে আমাকে এমন শাস্তি দেবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি। তার সন্তানগণ তার অসিয়ত অনুসারে কাজ করে। তখন আল্লাহ্ যমিনকে নির্দেশ দেন, সে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে। তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনর্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে দণ্ডায়মান হয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে বলেন : তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে : হে আমার প্রতিপালক! আপনার ভয়ে। তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।" বুখারী- ৩/১২৮৩, মুসলিম- ৪/২১১০।

এখানে আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফ্‌রী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমুদ্রে ছড়িয়ে দিলে মহান আল্লাহ্ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না এবং শাস্তিও দিতে পারবেন না। বাহ্যত তার এ ধারণা ছিল অজ্ঞতা প্রসূত। এ জন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ্-ভীতির কারণে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আমরা দেখি যে, একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফ্‌রী হলেও উক্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আরো একটি হাদীস থেকে জানা যায়, আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) ইয়েমেনের লোকদেরকে তাদের রাজাকে সম্মানের জন্য সিজদা করতে দেখেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে সিজদা করার সিদ্ধান্ত নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে তিনি এ কথা জানালে তিনি তাকে বলেন, সিজদা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত এবং তিনি গাইরুল্লাহ্‌র সিজদা চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেন।

নবম অধ্যায়

প্রকৃত সুন্নাতপন্থী : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয়ঃ

৯.১। **আহল :**
এর অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী ইত্যাদি। তাই আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী। অনুরূপভাবে আহলুল বিদ'আত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা বিদ'আতের অনুসারী।

৯.২। **সুন্নাত :**
'সুন্নাত'-এর অভিধানিক অর্থ মুখ, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। আর ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলে আকরাম (সা.) এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।

ইত্তিবায়ে সুন্নাত :
আমরা ইতোপূর্বে একাধিক হাদীসে দেখেছি যে, নাজাত, মুক্তি, জান্নাত ও সত্যের মাপকাঠি ও একমাত্র পথ 'সুন্নাতের অনুসরণ'। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীগণের কর্ম ও মতের উপর থাকাকে হাদীসে মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর দিকে বিভ্রান্ত দলসমূহের দুটি বৈশিষ্ট হচ্ছে মুখের দাবীর সাথে কর্মের অমিল এবং অনির্দেশিত কর্ম করা, যদিও তারা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাত বলে দাবী করে।

কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত :
'আহলুস সুন্নাত' এর পরিচয় বুঝতে হলে হাদীসে নববীতে এবং সাহাবী ও তাবি'য়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্নাত বলতে কী বুঝানো হয় তা জানা অত্যাবশ্যক। আর তা হচ্ছে, **কর্ম ও বর্জন** এই উভয়বিধ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হুবহু অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে কথা যেভাবে যতটুকু বলেছেন তা সেভাবে ততটুকু বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কথা বলেন নি তা না বলা এবং যে কাজ করেন নি তা না করাই সুন্নাত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণের ব্যতিক্রম করার ভয়াবহতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। তিনজন সাহাবী ইবাদাতের আবেগে রাসূলুল্লাহ্র (সা.) চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নফল ইবাদাত করতে চেয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)

প্রতিদিন নফল রোযা এবং সারারাত জেগে নফল সালাত আদায় করতেন। এঁদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায় এক ভাবেই বলেছিলেন, "আমি মাঝে মাঝে রোযা রাখি, আবার মাঝে মাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি, রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিয়ে করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" এক্ষেত্রে মূল কর্ম সুন্নাত-সম্মত হওয়া সত্ত্বেও কর্মের পাশাপাশি বর্জনের ক্ষেত্রে হুবহু অনুসরণ না করার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণের কর্মে ও আগ্রহে আপত্তি ও অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। (বিস্তারিত ৩.২.৮ অনুচ্ছেদ দ্র.)।

হুবহু অনুকরণ :
'কর্ম' ও 'বর্জন' হুবহু ও অবিকল হলেই তা সুন্নাত হবে, সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করে পালন বা বর্জন করলে তা ইত্তিবায়ে সুন্নাত বলে গণ্য হবে না।

ইমাম ইবনু শিরীন দরবেশগণের 'সূতী' বা 'পশমী' পোষাক নিয়মিত পরিধান করার বিষয়ে আপত্তি করে বলেছেন ঈসা (আ.) নবীর এই সুন্নাতের চেয়ে আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সূতী, কাতান, পশমী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কাপড় পরিধান করতেন। তাই ইবনু শিরীনের আপত্তি অনুকরণের হুবহুত্বে। যারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সূতি কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকেন তারা এ বর্জনকে তাকওয়া, দরবেশী বা বুজুর্গীর পথ বলে মনে করেন। আর এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত বর্জন এবং হুবহু অনুকরণ না করা।

৯.৩। আল-জামা'আত :

৯.৩.১। অর্থ ও পরিচিতি :
জামা'আত শব্দটি আরবী 'জাম'আ' থেকে গৃহীত যার অর্থ একত্রিত করা, জমায়েত করা, ঐক্যবদ্ধ করা। 'জামা'আত' অর্থ জনগণ, জনগোষ্টি, বা সমাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুক্তিপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত দলের পরিচিতি হিসাবে বলেছেন, তারা জামা'আত।

কুরআন ও হাদীসে 'জামা'আত' ও 'ইজতিমা' কে 'ফিরকা' ও 'ইফতিরাক' এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। জামা'আত অর্থ দলবিহীন সম্মিলিত জনগোষ্ঠি বা সমাজ। যে কোন স্থানে অবস্থানরত সকল মানুষকে জামা'আত বলা হয়। জামাতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথক হলে তাকে ফিরকা বা দল বলা হয়।

যেমন, একটি মসজিদে ১০০ জন মুসল্লী বসে আছেন। এরা মসজিদের জামা'আত। এদেরে মধ্য থেকে যদি কিছু সংখ্যক মুসল্লী যেমন দশ ও বিশ জন মুসল্লী পৃথকভাবে

একত্রিত হয়ে মসজিদের অন্য দিকে আলাদা আলাদা হয়ে বসেন তবে তারা একেকটি ফিরকা, দল বা সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য হবেন, তারা জামা'আত বলে গণ্য হবেন না। এক্ষেত্রে জামা'আত ভেঙ্গে বিভক্তি বা ইফতিরাক এসেছে দুটি দলের মধ্যে, তারা মূল জামা'আত থেকে বিছিন্ন হয়েছে। আর বাকী যারা কোন পৃথক দল বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গেছেন তারা নিজেদেরকে জামা'আত বলতে পারেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থা এরূপই। এটি মূলত কোন দল বা ফিরকা নয়। সাহাবী-তাবি'য়ীগণের অনুসরণে যারা মূল ধারার উপর অবস্থান করছেন এবং কোন দল বা ফিরকা তৈরী করেন নি তারাই 'আল-জামা'আত'।

৯.৩.২। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য অর্থে আল জামা'আত :

কুরআন, হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের বক্তব্যের আলোকে আমরা 'জামা'আত' শব্দের তিনটি প্রয়োগ দেখতে পাই। (ক) ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজ অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ, (খ) সাহাবীগণ এবং (গ) সাহাবীগণের অনুসারী তাবি'য়ী-তাবি-তাবি'য়ীগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ট মূল ধারার আলিম ও ইমামগণ। (শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা, আল-ইতিসাম ২/২৫৮-২৬৫)।

কুরআনুল কারীমে জামা'আতবদ্ধ বা দলাদলিমুক্তভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং দল, ফিরকা তৈরী ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসেও অনুরূপভাবে জামা'আতবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে, ইমাম বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে এবং 'বাইয়া' বলতে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুগত্যের শপথ বুঝানো হয়েছে।

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিছিন্ন হয়ে মত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" সহীহ্ মুসলিম ৩/১৪৭৬, ১৪৭৭, ১৮৪৮।

এ বিষয়ে অনুরূপ আরো একাধিক হাদীস আছে। সুতরাং হাদীসে সর্বদা জামা'আত বলতে দলাদলিবিহীন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে। ফিরকা, দল বা গ্রুপকে জামা'আত তথা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে হুযাইফা ইবনু ইয়ামান (রা.) বলেন, ভবিষ্যতে মুসলিম সামাজে দলাদলি সৃষ্টি হলে কী করা উচিত এমন এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

> "তুমি মুসলিমদের জামা'আত (সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি কোন জামা'আত না থাকে এবং কোন

ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে), সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল (ফিরকা) সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে। যদি তোমাকে কোন গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে। এভাবে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায়।" বুখারী-৩/১৩১৯, ৬/২৫৯৬, মুসলিম-৩/১৪৭৫।

এই সকল নির্দেশের অর্থ হলো, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বাস করবেন, সেই সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সেই সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত, তার দল বা গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। (ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারী ১৩/৭, শাউবাণী, নাইলুল আউতার ৭/৩৫৬-৩৫৭)।

৯.৩.৩। সাহাবীগণই মূল জামাত :

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনরূপ ইফতিরাক বা বিভক্তি ছিল না। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কিছু মতভেদ ছিল, তবে কখনোই তা বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি। তাঁদের মতভেদ বা ইখতিলাফ ছিল মূলত ব্যবহারিক ও ইজতিহাদী বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ে, যেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ নিষ্পত্তি হয়েছে। আলী (রা.) এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ের কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা ইফতিরাক বা বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি। এ ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়,

প্রথমত উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় হাজার হাজার সাহাবী জীবিত থাকলেও এবং তাঁদের অধিকাংশ আলী (রা.) এর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৪ জন ছাড়া আর কেউ তাঁর পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি : আলী, আম্মার, তালহা এবং যুবাইর (রা.)। এবং উভয় পক্ষ মিলে মোট সংখ্যা ৩০ এর নীচে। দ্বিতীয় যুদ্ধে আলী ও মুআবিয়া (রা.) এর উভয় পক্ষে অংশ গ্রহণকারীদের কেউই অপর পক্ষকে পৃথক দল বা ধর্মচ্যুত দল বলে গণ্য করেন নি বরং বিষয়টিকে তারা রাষ্ট্রীয় ও ইজতিহাদী বিষয় বলে গণ্য করেছেন। এমন কি খারিজীদের বিদ্রোহ ও তাদের দ্বারা নির্বিচারে মুসলিম হত্যা সত্ত্বেও আলী (রা.) তাদেরকে কাফির বলেন নি।

এভাবে দেখা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা কখনোই বিভক্তির পর্যায়ে যায়নি। মহান আল্লাহ্ কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীসে সাহাবীগণকে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ মূল নীতির ভিত্তিতেই তাবি'য়ীগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল প্রজন্মের সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ সাহাবীগণকে সামগ্রিকভাবে আদর্শ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর জামা'আত বলতে সাহাবীগণের পথ ও তৎপরবর্তী মূল ধারার তাবি'য়ী-তাবী-তাবি'য়ীগণের পথ বুঝানো হয়েছে।

তাই 'আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআত' এর অর্থ হচ্ছে 'সুন্নাত ও জামাতের অনুসারীগণ'। সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত বুঝানো হয় এবং সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতু সাহাবাহও এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'আল জামা'আত' বলতে মূলত সাহাবীগণের মত ও পথ বুঝানো হয়, যারা সাহাবীগণের মত ও পথের উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যারা জীবনে পরিপূর্ণ সুন্নাত প্রতিষ্টা করেন, সত্যের উপর একত্র ও একমত থাকেন, কোন বিভেদ বা দলাদলি করেন না এবং সুন্নাতের পথ অনুসারীদের বিরুদ্ধাচরণ করেন না তারাই আহলুস সুন্নাহ। তারা সাহাবীদের জামাত বা সামগ্রিক ঐক্যমত্যকে অনুসরণ করেন বলে তাদেরকে জামাত বলা হয়।

৯.৪। আকীদার ব্যাপারে মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূল নীতি

৯.৪.১। ইফতিরাক বা বিভক্তির বিষয়াদি

ঈমানের আরকানসমূহের মধ্যে কিছু বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি হয় নি বা বিভক্তি মেনে নেয়া হয় নি এবং কিছু বিষয়ে বিভক্তি হয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার মূল নীতি বুঝতে হলে আমাদেরকে বিভক্তির বিষয়গুলি এবং আহলুল বিদ'আত ও ইফতিরাকের আকীদার মূল নীতি জানা দরকার। কারণ বিদ'আতীদের বিদ'আতের বিপরীতেই জামা'আত সুন্নাত-সম্মত আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন।

যে সকল বিষয়ে বিভক্তি হয় নি :

ঈমানের আরকানসমূহের মধ্যে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্, তাওহীদুল উলুহিয়্যাত, মালাইকা ও গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয় নি। এ ছাড়া আর বাকী সকল বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে। তবে গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিক আল্লাহ্র কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত। আর আল্লাহ্র কালাম বা কথা বিশেষণ (সিফাত)-টির প্রকৃতি নিয়ে উম্মতের মধ্যে ব্যাপক বিভক্তি হয়েছে।

মতভেদ ও বিভক্তির বিষয় সমূহ হচ্ছে :

আকীদার উৎস, তাওহীদুল আসমা ও সিফাত, রিসালাতে বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি ঈমান, তাকদীর, পাপী মুসলিম, রাষ্ট্র ও মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক এবং ঐক্য ও বিভক্তি।

আখিরাতের প্রতি ঈমান-এর বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের আযাব, শাফা'আত ও জান্নাতে আল্লাহ্র দর্শনের বিষয়। এগুলির মধ্যে শাফা'আত ও আল্লাহ্র দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল আসমা ও সিফাত বিষয়ক মতভেদ।

তাকদীরের বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে তাও মূলত তাওহীদুল আসমা ও সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। মহান আল্লাহ্‌র ইল্‌ম, ন্যায়বিচার, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করেই এ বিষয়ক মতভেদ।

৯.৪.২। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল নীতি :

৯.৪.২.১। আকীদার উৎস বিষয়ে মূল নীতি :

আকীদার উৎস নির্ধারণে মতভেদই সকল মতভেদের ও বিভক্তির উৎস। বিদ'আতী ফিরকাগুলি সরাসরি কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করে নি। তারা কুরআন-সুন্নাহ্‌কে আকীদার উৎস বলে স্বীকার করে, কিন্তু তাদের অতিরিক্ত উৎসগুলিই তাদের মূল ভিত্তি।

আহলুস সুন্নাত ও জামা'আতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূল নীতি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাতের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকীদার একমাত্র মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করা। যে কোন বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের সকল নির্দেশনা সমানভাবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী তাবি'য়ী-তাবি-তাবি'য়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা। কুরআন-সুন্নাহ্‌ অনুধাবনের বিষয়ে তাঁদের মতামতের উপর নির্ভর করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, গূঢ় অর্থ নির্ণয় ইত্যাদির অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা। কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয় নি সে বিষয় আকীদার অন্তর্ভুক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো।

ইমাম তাহাবী বলেন, "শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে সহীহ সনদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য।" তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ-আত-তাহাবীয়্যাহ, পৃ: ১৪।

এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবিল ইয্‌য হানাফী বলেন, "প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকার মূল নীতি এই যে, কুরআন হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদ'আতী মানদণ্ডে অথবা যাকে তারা 'আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল' ও 'যুক্তি' বলে কল্পনা করে তার মানদণ্ডে বিচার করে। যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তির' সাথে মিলে যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে 'মহকাম' বা দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবী করে তা গ্রহণ করে এবং তাকে দলীল হিসাবে পেশ করে। আর কুরআন-হাদীসের যে বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তির' সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা মুতাসাবিহা বা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানকে তারা 'অর্থ-বিচার আল্লাহ্‌র কাছে ছেড়ে দেয়া' বলে আখ্যায়িত করে, অথবা এরূপ বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করে। . . . "

৯.৪.২.২। আল্লাহ্‌র নাম ও বিশেষণ (সিফাত) বিষয়ে মূল নীতি :
এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ও জামা'আতের মূল নীতি এই যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, আল্লাহ্‌র কোন নাম, কর্ম বা সিফাতকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের সাথে তুলনা করা পরিহার করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে কোন ব্যাখ্যা বর্জন করা। যেমন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। আবার পাশাপাশি মহান আল্লাহ্‌র শ্রবণ, দর্শন, কথোপকথন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর উঠা (অবস্থান নেয়া), ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসাব্বিহা ফিরকা আল্লাহ্‌র এ সকল বিশেষণ সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে কল্পনা করেছে। পক্ষান্তরে মু'তাযিলী, যাহমী, কাদারী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকা এই যুক্তিতে আল্লাহ্‌র এ সকল বিশেষণ ও কর্মকে অস্বীকার করেছে যে, "মহান আল্লাহ্ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন, সুতরাং এ সকল বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করার অর্থ হবে তাঁকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা। বরং তিনি এ সকল বিশেষণ থেকে পবিত্র, কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত এ সকল সিফাতকে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে। যেমন তাঁর হস্ত অর্থ তাঁর ক্ষমতা বা করুণা, আরশের উপর উঠা অর্থ আধিপত্য লাভ করা ইত্যাদি।"

এ বিষয়ে 'নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ' অনুচ্ছেদে **(২.৩.৩)** ইমাম আবু হানিফা (র.)-সহ প্রসিদ্ধ চার জন মুজতাহিদ ইমামের অভিমত আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৯.৪.২.৩। রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূল নীতি :
এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল নীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে কোন ব্যক্তির নিষ্পাপ, অভ্রান্ততা বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা। তাঁরা ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্থিত্ব বিশ্বাস করেন এবং এগুলিকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য 'কারামত' বা মর্যাদা ও নিয়ামাত বলে গণ্য করেন। কিন্তু এগুলিকে আকীদার উৎস হিসাবে কিংবা কুরআন-সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেন না। আলিম বা বুযুর্গ ব্যক্তি যতই বড় হোন, তিনি কখনোই ইসমাত বা অভ্রান্ততার পদমর্যাদা পাবেন না। তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র.) বলেন,

"প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু মত গ্রহণ করা হয় এবং কিছু মত বাদ দেওয়া হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম এ কবরে যিনি শায়িত আছেন তিনিই, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।" যাহাবী, সিয়ারুল আ'লামীন নুবালাহ ৮/৯৩।

এভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয় না। কুরআন ও সুন্নাতের মানদণ্ডে যাচাই করেই

সকল কথা গ্রহণ করতে হবে। কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাহ্ বিচার করা যাবে না, বরং কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রত্যেকের কথা যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে। অমুক বলেছেন, কাজেই তা দ্বীনের প্রমাণ বা আকীদার দলীল এরূপ চিন্তা করার সুযোগ ইসলামে নেই।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কুরআন কারীমে কিংবা হাদীসে যাদের বিষয়ে জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কাউকে সুনিশ্চিত 'ওলী' বলা তো দূরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না।

৯.৪.২.৪। পাপী মু'মিন বিষয়ক মূল নীতি :

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে পাপী মুসলিমদের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদেরকে সুনিশ্চিত জান্নাতী বা জাহান্নামী বলেন নি। বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তিপূর্বক ক্ষমার পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন। ইমাম তাহাবী বলেন, "আমরা পাপী মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের বিষয়ে ভক্তি অনুভব করি। তবে তাদেরকে নিরাশ করি না।" তাহাবী, মাতলুল আকীদাহ আত-তাহাবীয়্যাহ, পৃ: ১৪।

৯.৪.২.৫। রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মূল নীতি :

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশনা গ্রহণ করার মূল নীতির আলোকে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের কারণে তাকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ না সুনিশ্চিত কুফ্রী বা শিরকে সে নিপতিত হয়। পাপী শাসক-প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, তেমনি তার পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নষ্ট বা বিদ্রোহ করা যাবে না। মধ্য পন্থা অবলম্বন করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্টির সিদ্ধান্তের) বাইরে, দ্বিতীয় বর্ণনায়, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করে, তা হলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" বুখারী ৬/২৬১২, মুসলিম ৩/১৪১৭।

৯.৪.২.৬। ঐক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মূল নীতি :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূল নীতি হচ্ছে 'ঐক্য ও সংহতি'। বিভ্রান্ত দলগুলির সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থ্যক্য রয়েছে। প্রথমত, আকীদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাতের আলিমগণের আভ্যন্তরীন মতভেদ সীমিত এবং ব্যাখ্যা বা

পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত দলগুলির আকীদার উৎস অনেক হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তিও খুবই বেশী। মানবীয় বুদ্ধি, আকল, যুক্তি ইত্যাদির মতপার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে কাউকে 'মাসুম', 'অভ্রান্ত' বা কারো মতকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করলেও এরূপ বিভ্রান্তদের একজনের মতের সাথে অন্য জনের মতের মিল হয় না। আর এ সকল বিষয় যেহেতু তাদের মতে আকীদার মূল, সেহেতু তারা একে অপরকে কাফির বা বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ সকল মু'মিনকে যথাসম্ভব মু'মিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। এমনকি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ফিরকাগুলিকেও তাঁরা কাফির বলে গণ্য না করে বিভ্রান্ত মু'মিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত ফিরকাগুলি একমাত্র নিজেদেরকে ছাড়া অন্য সকলকেই ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।

৯.৪.৩। আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ :

মুসলিম উম্মাহ্র আলিম ও ইমামগণ, বিশেষত প্রসিদ্ধ চার জন মুজতাহিদ ইমাম আকীদাগত বিকৃতি বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে এবং সঠিক আকীদা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল :

(১) আকীদার মূল নীতিতে তাঁরা একমত ছিলেন। দু-একটি বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনায় (যেমন ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক ব্যাখ্যায়) সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া তাঁদের আকীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আকীদার বিষয়ে তাঁদের একমত হওয়ার মূল কারণ আকীদার উৎসের বিষয়ে তাঁদের ঐক্যমত্য। তাঁরা একমত যে আকীদার উৎস মূলত দুটি - কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীস। আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবীয়ীগণের ইজমা বা জামা'আত হলো তাঁদের মানদণ্ড। তারা একমত যে, কুরআন-হাদীসে যা যেভাবে আছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকীদার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না এবং সে বিষয়ে কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই।

(২) আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় তারা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তাঁদের চারজনের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (র.) আকীদার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত ইমাম আবু হানীফা (র.) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ট ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও ফিকাহ্-এর বিষয়ে তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তাঁর ফিকহী মতামতসমূহ তাঁর ছাত্ররাই গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। তাঁর আকীদা বিষয়ক বইগুলির মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবী (২৩৯-৩২১ হি.) 'আকীদাতুল আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আত' গ্রন্থটি

রচনা করেন, যা আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বজন স্বীকৃত ও সঠিক বই। হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয্‌য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি.) রচিত 'শারহুল আকীদা আত তাহাবীয়্যাহ' পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক।

(৩) ইমামগণ সকল বিদ'আত বিশেষত আকীদাগত বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন। আকীদার ক্ষেত্রে বিদ'আত ও বিভ্রান্তির মূল কারণ আকীদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি। যারা ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদিকে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকীদার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মতভেদ হবেই এবং মতভেদের সমাধান অসম্ভব। কাজেই তাদের আকীদার ক্ষেত্রে বিভাজন, বিভক্তি ও দলাদলি অবশ্যম্ভাবী।

ইজতিহাদ, বুদ্ধি, আকল বা কিয়াস এর প্রয়োজন হয় ফিক্‌হের ক্ষেত্রে। কারণ যুগের পরিবর্তনে কুরআন বা হাদীসে নেই এমন অনেক নূতন বিষয় মুসলিমের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সে বিষয়ে বিধান দিতে হয় ফিক্‌হের ক্ষেত্রে। কিন্তু আকীদার বিষয়ে তা নয়। আকীদার সম্পর্ক গাইবী জগতের সাথে এবং আল্লাহ, ফিরিশতা, নবীগণ, কিতাব, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদির সাথে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনু আব্দুল বার্‌র ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি.) বলেন,

"সকল দেশের ফকীহগণ ও আহলুস সুন্নাতের সকল ইমাম, যারা হাদীস ও ফিক্‌হের ইমাম তারা সকলেই একমত যে, ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস নিষিদ্ধ এবং ফিক্‌হী আহকামের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রযোজ্য।" ইবনু আব্দুল বার্‌র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ও যাযলিহি, পৃ: ৭৪।

দশম অধ্যায়
বিদ'আত ও বিভক্তি

সাহাবীগণ দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদেরকে বার বার সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিদ'আত, উদ্ভাবন বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করছেন। তবুও সাহাবীদের সাহচর্য বঞ্চিত দ্বিতীয় প্রজন্মের আবেগী মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ'আতের উৎপত্তি হয়ে প্রসারলাভ করতে থাকে। তবে দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তির সূচনা হলেও তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগন্য। বিশেষত সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী তাবি'য়ীগণ সুদৃঢ়ভাবে সাহাবীগণের পথ অনুসরণ করতেন। তাঁরা বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদেরকে আহলুল বিদ'আত বা বিদ'আত পন্থী বলে অভিহিত করতেন।

১০.১। বিদ'আতের পরিচয়

১০.১.১। অভিধানিক অর্থে বিদ'আত :

বিদ'আত শব্দটি আরবী 'বাদা'আ' ক্রিয়া থেকে গৃহীত নাম। "বাদা'আ অর্থ নব-উদ্ভাবন বা অনাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান (Innovation)।" বিদ'আত অর্থ নব-উদ্ভাবিত কোন বস্তু বা বিষয় যার কোন অস্তিত্ব, নকশা বা উদাহরণ ছিল না। "আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 'বাদী'উ' অর্থাৎ উদ্ভাবক এবং অনাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদাতা বা সৃষ্টিকর্তা। যে ব্যক্তি কোন বিষয় নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সে তার বিদ'আতকারী বা উদ্ভাবক।"

বিদ'আতের ক্ষেত্র দুটি, জাগতিক এবং দ্বীনী বিষয় সম্পর্কিত।

জাগতিক বিদ'আত :

মানব সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের ধারার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা মানব জাতির জীবনোপকরণের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষের বসবাস, যাতায়ত, পানাহার, চাষাবাদ, ব্যবসায়, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সকল বিষয়ে নব নব উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের ধারা অব্যাহতভাবে চলছে। এসব উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো অর্থাৎ উপকার করা। তবে প্রকৃত উপকারের মাপকাঠি হচ্ছে উদ্ভাবিত উপকরণ মানুষের সত্যিকার উপকারে ব্যবহৃত হয়েছে কি না। আবিষ্কারের বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও ব্যবহার ইসলামের নির্দেশের বিরোধী হলে তা অবশ্যই নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিবেচিত হবে। আর ইসলামের নির্দেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে জাগতিক কোন

উদ্ভাবন নিন্দনীয় নয়। তাই রাসূল (সা.)-এর সময় যে সকল জাগতিক উপকরণ ছিল না সে সকল উপকরণ বর্তমান কালে ব্যবহার করা দ্বীনি অর্থে বিদ'আতের আওতায় আসবে না।

দ্বীনী বিষয়ক বিদ'আত :

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ আকারে নাযিল করেছেন বিধায় দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন দুই প্রকার হতে পারে : আকীদা বিষয়ক ও কর্ম বিষয়ক। এই পুস্তকের মূল বিষয় আকীদা, তাই এখানে শুধু আকীদা বিষয়ক বিদ'আত আলোচিত হবে।

বিদ'আতের সংজ্ঞা :

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল জাওহারী (৩৯৩ হি:) বলেন,

"আল-বিদ'আত অর্থ পূর্ণতার পর দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন।"

ফাইরোয-আবাদী (৮১৭ হি:) বলেন,

" . . . রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পরে (দ্বীনে) যে মতবাদ বা কর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে।"

আল্লামা ইবরাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতিবী (৭৯০ হি:) বলেন,

"বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীনের মধ্যে শরীয়তের পদ্ধতির তূল্য কোন নব-আবিষ্কৃত পদ্ধতি যা মহান আল্লাহ্র অতিরিক্ত ইবাদাতের আশায় করা হয়।"

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি:) তাঁর আদ-দুর্‌রুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতের পরিচয়ে বলেন,

"বিদ'আত হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যতিক্রম কোন বিশ্বাস, যে ব্যতিক্রমের কারণ ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ্র প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা।"

১০.১.২। কুরআন কারীমে বিদ'আত

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ'আত হচ্ছে এমন কর্ম যা করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন নি, তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে। আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদাতের আগ্রহ নিয়ে তা উদ্ভাবন করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। কারণ কোন কর্ম কতটুকু মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি সেভাবেই বিধান দেন। মহান আল্লাহ্ খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলেন,

> "কিন্তু সন্ন্যাসবাদ - এতো তারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছিল, আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি, অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি।" সূরা হাদীদ-৫৭:২৭।

সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে আখিরাতমূখী হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলেন নি। সন্ন্যাসবাদ ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ওহীর অনুসরণ বাদ দিয়ে মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে নূতন রীতি আবিষ্কার করা। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিপরীত ফল দিয়েছে। মধ্যযুগের খৃষ্টান মঠগুলির ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে পারি।

১০.১.৩। হাদীসে নববীতে বিদ'আত :

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন এবং তা ধ্বংসের কারণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ অর্থে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর হাদীসে দেখেছি যে, তিনি পদ্ধতিগতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ব্যতিক্রম করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মাসের কিছুদিন সিয়াম পালন করতেন, পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ (রা.) সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন ও সারা মাস নফল সিয়াম পালন করতেন। যদিও এতদোভয় ইবাদাতই অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং যতবেশী করা যায় ততই পুণ্য অর্জন হয় এবং তদুপরি সারারাত তাহাজ্জুদ বা সারা মাস নফল সিয়াম পালন মূলত নিষিদ্ধ নয়, তথাপি বিষয়টির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (পন্থা)-কে অপছন্দ (তথা ব্যতিক্রম) করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।" এর পর তিনি বলেন, ". . . যার (ইবাদাতের) প্রশান্তি সুন্নাতের দিকে হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংশ প্রাপ্ত হবে।" তিনি আরো বলেছেন, কোন আবিদ যদি কর্মের উদ্দীপনায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা ধ্বংসাত্মক নয়। তবে তার স্থিতি যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক হবে।

অন্য হাদীসে জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন,

"সত্যতম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন), আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ; সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব-উদ্ভাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" আর প্রতিটি "বিদ'আত"ই পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতা জাহান্নামের মধ্যে (পৌছায়)। সহী মুসলিম- ২/৫৯২-৫৯৩, নাসাঈ- আস সুনান ৩/১৮৮। এই মর্মে প্রায় একই ভাষায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রা.) থেকেও একটি হাদীস রয়েছে (ইবনু মাজাহ, আস সুনান ১/১২)।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"আমাদের (তিনি ও তাঁর সাহাবীগণের) এ কাজের (ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের) মধ্যে যে নূতন কোন বিষয় উদ্ভাবন করবে যা তাতে নেই তার সে কাজটি (সম্পূর্ণ) রদ তথা প্রত্যাখ্যাত।" বুখারী-৩/৮৬১, মুসলিম-৪/২৬৬।

তাবি'য়ী হাসান বসরী (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উম্মাত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" আব্দুর রাজ্জাক সানআনী, আল মুসান্নাফ ১১/২৯১, নং ২০৫৬৮।

বিদ'আত বিষয়ক রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) হাদীসগুলির পর্যালোচনা করলে আমারা দেখতে পাই - দ্বীনের মধ্যে সকল নব-উদ্ভাবনই বিদ'আত, সকল বিদ'আতের অবস্থান সুন্নাতের বিপরীতে এবং মূলত বর্জনের সুন্নাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা করেন নি বা বলেন নি, অর্থাৎ তিনি যা করা বা বলা বর্জন করেছেন তা ইবাদাত, কামালাত বা বুজুর্গী মনে করা হচ্ছে বিদ'আত।

ইবাদাতের উদ্দীপনা এবং কবুলিয়্যাত ও সওয়াবের আশাতেই বিদ'আত বা সুন্নাতের পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা হয়, এ জন্য বিদ'আত কবুল হবে না বলে হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, এর কারণ দ্বীন যেখানে পূর্ণ সেখানে নতুন কিছু সংযোজন করার অর্থ হচ্ছে পূর্ণতাকে অপূর্ণ মনে করা। এ ছাড়া বিদ'আতীরা বিদ'আতকে পাপ মনে না করে পুণ্যকাজ বলেই মনে করে বিধায় পাপের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় না, ফলে তাদের তাওবা নসীব হয় না। তদুপরি বিদ'আত-এর উদ্ভাবনকারী ও অনুসারীদের আমলনামায় তাদের পরবর্তী সকল অনুসারীদের পাপের সম পরিমাণ পাপ জমা হতে থাকে, পরবর্তী অনুসারীদের পাপের কোন লাঘব ছাড়াই।

১০.১.৪। সাহাবী-তাবি'য়ীগণের বক্তব্যে বিদ'আত :

খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকেও আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল প্রকার ইবাদাত, বন্দেগী, নেককর্ম, মতামত, বিশ্বাস সবই বিদ'আত। এক হাদীসে ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন,

"তোমরা অবশ্যই ইলম শিক্ষা করবে। আর খরবদার! তোমরা কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত হবে না। খবরদার! তোমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না। খবরদার তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।" দারিমী, আস-সুনান- ১/৬৬।

অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

"তোমরা অনুসরণ করো, উদ্ভাবন করো না, কারণ দ্বীনের মধ্যে যা আছে তাই তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ।" দারিমী, আস-সুনান- ১/৮০।

উসমান বিন হাদির ইবনু আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বলেন,

"হাঁ, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, ইসলামের বিধিবিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে।

তুমি অনুসরণ বা ইত্তিবা করবে, বিদ'আত উদ্ভাবন করবে না।" দারিমী, আস-সুনান ১/৬৫।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন,

"প্রতি বৎসরই মানুষ কিছু বিদ'আত উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেঁচে থাকবে আর সুন্নাতসমূহ বিলীন হয়ে যাবে।" হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৮৮।

হুযাইফা (রা.) একটি হাদীসে বলেন,

"সাহাবায়ে কেরাম যে ইবাদাত করেন নি, তোমরা কখনো সে ইবাদাত করবে না। কারণ পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কথা বলার (কোন নূতন ইবাদাত উদ্ভাবন করার) কোন সুযোগ রেখে যান নি। হে আল্লাহ্র পথের পথিকগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন করে চল।" সুযূতী, আল-আমরু বিল ইত্তিবা, পৃঃ ১৭।

তিনি অন্যত্র বলেন,

" . . . আল্লাহ্র কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোন বিদ'আত বর্জন করা হয় তাহলে সবাই বলবেঃ সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (অর্থাৎ বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই সুন্নী হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে, অপর দিকে সুন্নাতকেই বিদ'আত ভাবা হবে)।" আল-কুরতুবী, আল বিদাউ ওয়ান নাহইউ আনহা, পৃঃ ৫৮।

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা.) একদিন বলেন,

"তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন শিক্ষার পথ খুলে যাবে। মু'মিন-মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুরআন শিখবে। তখন হয়ত কোন ব্যক্তি বলবে : মানুষের কী হলো, আমি কুরআন শিক্ষা করলাম, অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না? কুরআন ছাড়া কোন নতুন মত বা কাজ উদ্ভাবন না করলে মানুষেরা আমার অনুসরণ করবে না। (আমি এত বড় আলিম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। কাজেই মানুষের মধ্যে আমার সঠিক মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোন মতামত বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা)। খবরদার! তোমরা বিদ'আতের কাছেও যাবে না। নিঃসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথভ্রষ্টতা।" আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২০২; হাকীম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫০৭।

এ হাদীসের আলোচনায় আল্লামা শাতিবী উল্লেখ করেছেন যে, "বিদ'আতের উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র ইবাদাতে অধিক্য অর্জন। বিদ'আতী আল্লাহ্র ইবাদাতের দিকেই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, কিন্তু ইবাদাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্র (সা.) পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা জরুরী মনে করেন না। এ ছাড়া মানবীয় প্রকৃতি পুরাতন ও নিয়মিত কর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নতুন নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও কর্ম প্রেরণা লাভ করা যায় যা পুরাতনের মধ্যে থাকে

না। এজন্য বলা হয়, প্রত্যেক নতুনের মধ্যেই মজা'। বিদ'আতীদের তত্ত্ব এই যে, মানুষের মধ্যে অপরাধ বেড়ে গেলে যেমন অপরাধ ধরা ও বিচার করার জন্য পদ্ধতিও বেড়ে যায়, অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে ইবাদাতের অবহেলা প্রসার লাভ করলে তাদের অবহেলা কাটাতে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। মু'আয (রা.) এ বিষয়েই সাবধান করেছেন।" শাতিবী, আল-ই'তিসাম ১/৫৪-৫৬।

১০.১.৫। তথাকথিত ভাল বিদ'আত ও মন্দ বিদ'আত তত্ত্ব :

উমার (রা.) তাঁর খিলাফতের সময় রমযানের রাত্রে কিয়ামুল লাইল (বা রাত্রের নামায) তথা তারাবীহ নামায নিয়মিতভাবে জামা'আতে পড়ার প্রচলন করেন এবং পরে মানুষের এই সুন্নাত সালাত জামা'আতে পড়ার দৃশ্য দেখে তা একটি ভাল বিদ'আত বলে উল্লেখ করেন (বুখারী ২/৭০৭)। তারাবীহ সালাত জামা'আতে পড়াকে তিনি যে বিদ'আত এবং একটি ভাল বিদ'আত বলেছেন তা নিতান্তই অভিধানিক অর্থে, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কয়েকবার তা জামা'আতে আদায় করেছেন, তবে ফরয হয়ে যাওয়ার এবং তাতে উম্মাতের কষ্ট হওয়ার আশংকায় তিনি তা নিয়মিত জামা'আতে আদায় করেন নি। উমার (রা.) তা নিজে জানতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পর জামা'আতে পড়লে তা আর ফরয হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় এই সুন্নাত তথা নিয়মিত জাম'আতে তারাবীহ পড়ার পুনঃ প্রচলনকে ভাল কাজ বলেছেন, কেননা তা আদৌ নব-উদ্ভাবিত বিষয় ছিল না। কিন্তু বিদ'আতীদের অনেকে এই হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করত ভাল ও মন্দ বিদ'আতের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তাদের বুঝ অনুযায়ী কিছু বিদ'আতকে ভাল বিদ'আত আখ্যা দিয়ে তা পালন করা পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। এটা মনে রাখা দরকার যে, সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক ব্যতিক্রমের অধিকার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণকে দিয়েছেন এবং এরূপ কর্মকে তাঁদের সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নাত সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন। কোন কাজটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিশেষ কারণে করেন নি, তবে তার পরে করা যেতে পারে, তাও তাঁরা সঠিকভাবে বুঝতেন। ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁরা সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে বিদ'আত বলে নিন্দা করেছেন।

১০.১.৬। বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

বিদ'আত দু'ভাগে বিভক্ত : ১) আকীদা বা বিশ্বাসের বিদ'আত এবং ২) কর্মের বিদ'আত। এখানে আকীদার বিদ'আতের আলোচনা করা হচ্ছে, কারণ মুসলিম সমাজের বিভক্তি মূলত আকীদার বিদ'আতকে কেন্দ্র করে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৩০-৩৫ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাবা ও তার অনুসারী শীয়াগণ নবী-বংশের ভালবাসা ও ভক্তির নামে বিভিন্ন বিদ'আতী আকীদা প্রচলন করে, যা কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। প্রায় একই সময়ে আলী

(রা.) এর খিলাফাত কালে (৩৫-৪০ হি) খারিজীদের বিবিধ বিদ'আতী আকীদার উন্মেষ ঘটে। এর পরে যুগে যুগে আরো অনেক বিভক্ত দল-উপদলের সৃষ্টি হয় যারা বিভিন্ন ধরনের বিদ'আতী আকীদার প্রচলন করে। প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকা নিজেদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রকৃত অনুসারী এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক অনুধাবনকারী বলে দাবী করেছে। প্রত্যেকেই নিজেদেরকে একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত ফিরকা বলে দাবী করেছে। প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে তাদের মতের পক্ষে নিজ বুঝ ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনেক অকাট্য (!) দলীল প্রদান করেছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে এ সকল দাবীর যথার্থতা এবং বিভিন্ন ফিরকার বিভক্তির কারণসমূহ জানা যাবে।

১০.২। মুসলিম উম্মাহ্র আকীদাগত বিভাজন বা ইফতিরাক :

ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভাজন ইসলামী আকীদার অন্যতম বিষয়। সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি ও বিদ'আতের উদ্ভাবনই ইফতিরাকের মূল কারণ।

১০.২.১। ইফতিরাক এর অর্থ :

ইফতিরাক শব্দটি আরবী 'ফারাকা' শব্দ থেকে গৃহীত। 'ফারাকা'-এর অর্থ পার্থক্য করা, বিভক্ত করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা, বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। এটি 'ইজতিমা' (ঐক্য) শব্দটির বিপরীত। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তোমরা আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" সূরা আল-ইমরান ৩:১০৩।

এখানে আল্লাহ্ ঐক্যবদ্ধ থাকার বিপরীতে ইফতিরাক বা বিচ্ছিন্নতাকে উল্লেখ করেছেন।

ইখতিলাফ বা মতভেদ : ইফতিরাক-এর নিকটবর্তী একটি শব্দ হচ্ছে ইখতিলাফ। এর অর্থ মতের অমিল হওয়া, যা সাধারণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে মতভেদ নিন্দনীয় বা দোষনীয় নয়, বরং একাধিক মুজতাহিদের মতামতের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে কোন বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। মুজতাহিদ ভুল করলে আল্লাহ্র নিকট থেকে একটি পুরস্কার এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দুটি পুরস্কার লাভ করেন। ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলিল ও ইল্ম, এবং ইখতিলাফকারী আলিমগণ নিজেকে সঠিক মনে করলেও অন্যমতের আলিমদেরকে বিভ্রান্ত বা সম্পূর্ণ ভুল বলেন না, দুর্বল মনে করতে পারেন।

পক্ষান্তরে মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র 'হক্ক' ও অন্য মতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্যমতের অনুসারীদের 'অন্যদল' মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা 'বিচ্ছিন্নতায়' পরিণত হয়। এটা ইখতিলাফ বা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়। ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ এবং

ইখলাসের অনুপস্থিতি। ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলিম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন।

১০.২.২। কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে ইফতিরাক :

(১) পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে ইফতিরাক :

কুরআন কারীম ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে আসমানী হেদায়েতপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দলাদলি ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি দেখা দেবে বলে জানিয়েছেন। এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিভক্তি ও দলাদলির মূল কারণ ছিল ওহীর শিক্ষার ব্যতিক্রম করা বা ওহীর শিক্ষার কিছু ভুলে যাওয়া কিংবা বাদ দেয়া বা পরিবর্তন করা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হওয়া, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা, পূর্ববর্তী গুরুদের অতিভক্তি ও অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদি।

ইহুদী-খৃষ্টানদের বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তার এক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আমি কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি। তারা যা করত আল্লাহ্ তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।" সূরা মায়িদা, ৫:১৪-১৫।

খৃষ্টানদের উপর নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ ভুলে যাওয়ার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব সাধারণ মানুষকে পড়তে দিত না, অনেক অবহেলা ও অযত্নে কিতাবের অনেক অংশ হারিয়ে ফেলে, অনেক কিছু পরিবর্তন করে এবং মনগড়া কথা রচনা করে মূল কিতাবের শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়।

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, তাদের ইফতিরাক ও দলাদলির কারণ অজ্ঞতা ছিল না, বরং জ্ঞান আসার পরেও জিদ, হিংসা, ঔদ্ধত্য, নিজ মতকে চূড়ান্ত সত্য মনে করে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হওয়া, নিজ মত পরিত্যাগকে অপমান বলে গণ্য করা এবং সর্বোপরি ইখলাস ও তাকওয়ার অনুপস্থিতিই ছিল ইফতিরাক বা দলাদলির কারণ। মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা নিজেদের মধ্যে বিভেদ-দলাদলি করে।" সূরা শূরা, ৪২:১৩।

[এ বিষয়ে অন্যান্য আয়াত দেখুন- ৫:৬৪, ২:২১৩, ২৩:৫২-৫৩, ৩০:৩২, ৪৫:১৭]

আহলুল কিতাবের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ অতিভক্তির কারণে ওহীর অতিরিক্ত মতামত উদ্ভাবন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ। এ কারণে ইহুদীরা উযাইর (আ.)-কে এবং খৃষ্টানরা ঈসা (আ.) কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ নামক মনগড়া মতভেদ এবং ঈসা (আ.) এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা নিয়েই তাদের যত ফিরকাবাজি। [দেখুন আয়াত ৪:১৭১, ৫:৭৭]।

(২) মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক :

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ্ বারংবার এ উম্মাহকে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ক একটি আয়াত আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে দেখেছি। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন,

> "তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" সূরা আল ইমরান, ৩:১০৫। [অনুরূপ আয়াত ৩০:৩০-৩২, ৬:১৫৩, ৬:১৫৯]

এক হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি) পদে পদে অনুসরণ করবে : বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি কোন গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ করবে।" আমরা বলালাম : 'পূর্ববর্তীগণ বলতে কি ইহুদী-খৃষ্টানরা?' তিনি বললেন, "তবে আর কারা ?" বুখারী, ৩/১২৭৪, মুসলিম, ৪/২০৫৪। [অনুরূপ হাদীস আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বুখারী, ২৬৬৯]

অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণের পরের যুগে বিভক্তি আসবে এবং বিভক্তি থেকে আত্মরক্ষার পথও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এবং তা হলো তাঁর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর অটল থাকা। অন্য অনেক হাদীসে তিনি বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের কিছু বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছেন। আলী (রা.) এবং ইবনু মাসুদ (রা.) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

"শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্ষতা, বোকামী ও প্রগল্ভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তম্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদের পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে, কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার থাকবে।" বুখারী, ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭, মুসলিম, ২/৭৪৬, তিরমিযী, ৪/৪৮১, নাসাঈ, ৫/১৬১।

এই অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

অন্য কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মাতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানিয়েছেন। একটি হাদীসে মু'আবিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে এবং একটি দলই জান্নাতে যাবে। এ দলটি হলো 'জামা'আত'।" আবু দাউদ ৪/১৯৮। [অন্যান্য সাহাবী থেকে অনুরূপ হাদীস- তিরমিযী, ৫/২৫, ৫/২৬]।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত বিভক্তদের দল উপদল আভ্যন্তরীন বিভক্তির কারণে বাড়তে থাকে, ফলে এদের সংখ্যা অনেক হলেও অনুসারীদের সংখ্যা কম। দ্বিতীয়ত ৭২ দলই জাহান্নামী এর অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির বা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী। বরং এদের বৃহত্তর অংশই বিশ্বাসগত পাপের কারণে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার কারণে পাপী মুসলিম হিসাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

১০.৩। ইফতিরাকের তথা বিভক্তির কারণ :

১০.৩.১। ওহী ভুলে যাওয়া :

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী উম্মাত এবং এ উম্মাতের মধ্যে ইফতিরাক বা বিভক্তির মূল কারণ হচ্ছে ওহীর অংশ ভুলে যাওয়া।

ওহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। অবহেলার মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বিলুপ্ত হওয়া, ব্যাখ্যার নামে মূল ওহী বাদ দিয়ে ব্যাখ্যাকেই ওহীর স্থলাভিষিক্ত করা, পাদ্রী-যাজকদের মাসুম বা নিষ্পাপ-নির্ভুল বলে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকে ওহীর সমতুল্য বলে গণ্য করা, ওহীর নামে বানোয়াট বা মিথ্যা কথা প্রচার করা, দর্শন, যুক্তির মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বাদ দেয়া, জাগতিক স্বার্থের কারণে ওহীর নির্দেশনা বিকৃত করা ইত্যাদি। মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্তরা যেভাবে ওহী ভুলেছে বা ভুলতে চেষ্টা করেছে তার মধ্যে আছে :

(ক) ওহী বা কুরআন ও হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যার অধিকার কারো নেই বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে সরিয়ে রাখা। বিশেষ করে শীয়া সম্প্রদায়ের বাতিল আকীদাগুলির এটি অন্যতম।

(খ) ওহীর ব্যাখ্যায় কোন আলিম, মাসুম ইমামের বা অন্য কারো বিশেষ অধিকার আছে বলে দাবী করে তার 'ইলম লাদুন্নী', কাশফ, ব্যাখ্যা বা মতামতকে ওহীর অংশ ও আকীদার ভিত্তি বানিয়ে দেয়া। এটিও শীয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম।

(গ) ওহীর পাশাপাশি দর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদিকে ওহীর মতই আকীদার উৎস হিসাবে গ্রহণ করা। সকল বিভ্রান্ত দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) ওহীর তাফসীর বা ব্যাখ্যার নামে নিজেদের বা কোন আলিম বা কোন বুজুর্গের মতামতকে ওহীর সাথে আকীদার অংশ বানিয়ে নেয়া। সকল বিভ্রান্ত ফিরকার এটাও বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) ব্যাখ্যার নামে ওহীর কিছু অংশ বাতিল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আকীদার মধ্যে গণ্য করা। এতে ওহীর মূল ভাষা আকীদা থেকে ভুলে যাওয়া হয়। সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটাই বৈশিষ্ট্য।

(চ) বানোয়াট কথা বানিয়ে ওহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরী করা বা জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা ঘটনার উপরে আকীদার ভিত্তি স্থাপন করা। এটি শীয়া ও অন্যান্য অনেক ফিরকার বৈশিষ্ট্য।

১০.৩.২। মনগড়া (আরবীতে 'হাওয়া') মতামতের অনুসরণ :

কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওহীর বদলে 'হাওয়ান নাফ্স' বা ব্যক্তি মনের পছন্দ-অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ। হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ উম্মাতের ৭৩ দলের ৭২ দলই পছন্দ বা মনগড়া মতের অনুসরণ করবে। নিজের পছন্দের মতের অনুসরণ (ইত্তিবাউল হাওয়া) এর স্বরূপ হলো, একটি মত বা কর্ম মানুষের কোন কারণে ভাল লাগবে বা সঠিক বলে মনে হবে। এরপর সে এই মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। ওহীর যে বিষয়টি তার মতের পক্ষে থাকবে সেটি সে গ্রহণ করবে। আর যে বিষয়টি তার মতের বিরুদ্ধে যাবে তা সে প্রত্যাখ্যান করবে বা ব্যাখ্যা করবে। ইহুদী-খৃষ্টানদের মত মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্ত ও বিভ্রান্ত দলগুলিরও এটি মূল বৈশিষ্ট্য।

১০.৩.৩। হিংসা-বিদ্বেষ :

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিংসা, বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা বিভক্তি বা ইফতিরাকের অন্যতম কারণ। ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং পারস্পরিক পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বোধ থাকলে ধর্মীয় মতভেদ নিরসন হয়ে যায়। কিন্তু মতভেদকারীদের মধ্যে এর বদলে হিংসা-বিদ্বেষ থাকার কারণে বিভক্তির জন্ম হয়।

১০.৩.৪। যা করতে নির্দেশ দেয়া হয় নি তা করা :

'যা করতে বলা হয় নি তা করা' এর অর্থ হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে যে সকল কাজের নির্দেশ দেয়া হয় নি, ওহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মধ্যেমে সে সকল কাজকে দীনের বা আকীদার অংশ বানিয়ে নেওয়া। যেমন, ওহীর মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অসৎকাজে লিপ্তকে হত্যা করতে বা শাস্তি দিতে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নির্দেশ দেয়া হয় নি। কিন্তু খারিজীগণ ওহীর অনুসরণের নামে তা করেছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের ভালবাসতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার নামে আলী (রা.)-কে সাজদা করতে, তাঁর বিশেষ গাইবীজ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করতে, তাঁকে নিষ্পাপ বলে দাবী করতে বা অন্যান্য সাহাবীকে ঘৃণা করতে নির্দেশ দেয়া হয় নি, কিন্তু শীয়াগণ তা করেছে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরগণের বেদনায় ব্যথিত হওয়ার নামে মাতম বা তাজিয়া বের করা, শোক-সমাবেশ করা, নিজেকে আঘাত করে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি ইসলামের নির্দেশ নয়। আবার তাঁদের জন্ম দিনে বা অন্য কোন দিনে তাঁদের ভালবাসা বা আনন্দের নামে মিছিল, উৎসব ইত্যাদি করাও ইসলামের নির্দেশ নয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এবং বিভিন্ন জাল দলিল তৈরী করে শীয়াগণ এরূপ করে। সুন্নিদের একাংশও শীয়াদের অনুকরণ করে থাকে এবং বিশেষত উপমহাদেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্মদিনের খুশীকে ঈদে মিলাদুন্নবী নাম দিয়ে নানা উৎসব ও মিলাদ মাহফিল উদযাপন করে। অথচ এগুলির কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও বিভ্রান্তরা ওহীর ব্যাখ্যার নামে তা করে থাকে।

১০.৩.৫। অন্যান্য কারণ :

এ ছাড়া সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি, অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, মুহকাম (সুস্পষ্ট বিধান) রেখে মুতাশাবিহার (অস্পষ্টের) অনুসরণ এবং কর্মহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরিত্য সন্ধান ইত্যাদি হচ্ছে ইফতিরাক তথা বিভক্তির অন্যতম কারণ।

১০.৪ বিভক্তির স্বরূপ ও বিভ্রান্তির বিষয়াদি :

১০.৪.১। বিভক্তি বা ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট :

ইসলামের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ইরাণ, ইরাক, মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এদের অনেকেই সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করতে পারেন নি। ফলে ইসলামের মূল প্রেরণা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়া তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের বিভিন্ন মতামত, বিতর্ক ও তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন যুক্তি, দার্শনিক মতামত ইত্যাদি তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এগুলির ভিত্তিতেই তারা ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক ও পর্যালোচনা শুরু করেন এবং নতুন নতুন মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। এগুলির পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদও বিভক্তির একটি প্রেক্ষাপট রচনা করে।

এ প্রেক্ষাপটে প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফিরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল এরূপ বিভক্তি ও বিভ্রান্তি শুরু করে। এরা হচ্ছে (১) খারিজী ও (২) শীয়াগণ। সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি বাড়তে থাকে এবং নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে। প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নূতন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে। কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

১০.৪.২। বিভ্রান্তির বিষয়াদি :

বিভ্রান্তির বিষয়াদির মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলিই মূলত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(১) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের ভালবাসা ও মর্যাদা

(২) ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান

(৩) রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইমামাত

(৪) তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

(৫) আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণে বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা।

এছাড়া ইতোপূর্বে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে যে, আকীদার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তিই সকল বিভ্রান্তির প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে।

১০.৫। বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ (প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ)

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে প্রসিদ্ধ ফিরকা ছিল ৪টি : (১) শীয়া, (২) খারিজী, (৩) কাদারিয়্যাহ ও (৪) মুরজিয়্যাহ। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ফিরকা ৯টিতে পরিণত হয় : (১) শীয়া, (২) খারিজী, (৩) কাদারিয়্যাহ (৪) মুরজিয়্যাহ (৫) জাহমিয়্যাহ, (৬) নাজারিয়া, (৭) জাবারিয়া, (৮) কালাবিয়া ও (৯) মুশাব্বিহা।

এদের অধিকাংশ ফিরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক নতুন ফিরকার উদ্ভব ঘটেছে। এ সকল প্রাচীন ফিরকার মধ্যে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় এখনো বিদ্যমান। এ ছাড়া অন্যান্য ফিরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকীদা বর্তমান যুগে পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে মূল ফিরকগুলির বর্ণনা করা হলো।

১০.৫.১। শীয়া ফিরকা

১০.৫.১.১। উৎপত্তি ও মূল নীতি

মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম ও প্রধান দুটি ফিরকা শীয়া ও খারিজী এর উদ্ভব ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে। শীয়া শব্দের অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে আলী (রা.)-এর দল বা অনুসারী বুঝানো হয়। শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবী। এ দাবীকে কেন্দ্র করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

রিসালাতের বিশ্বাসের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, সাহাবী ও মূলধারার তাবীয়ীগণ কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশের মানুষদের সম্মান করেছেন, তাদের ভালবেসেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন বিশেষ 'পবিত্রতা' বা 'অধিকার' প্রদান করেন নি। নবী বংশের মানুষেরাও কখনোই এরূপ কিছু দাবী করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের কেউ কেউ আশা করতেন যে, আহলুল বাইত থেকে আলী (রা.)-কেই নির্বাচন করা হবে। আনসারগণও তাদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন। শেষ পর্যন্ত 'জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে' আবু বকর (রা.)-কে নির্বাচন করা হয় এবং আলী (রা.)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত হয়ে যান।

এই প্রক্রিয়ায় পরপর তিনজন খলীফা নির্বাচিত হলে আলী (রা.)-এর কিছু সমর্থক হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন এবং আলী (রা.) খলীফা হওয়ার বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে মনে করতে থাকেন। তাদের দাবীর যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে তারা নবী বংশের লোকজনের এমন সব মর্যাদার কথা দাবী করতে থাকেন যা ইসলামী আকীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচার হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক একজন ইহুদী ইসলাম গ্রহণের দাবী করে। এ ব্যক্তি ও তার অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনু আবী তালিব (রা.)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ও উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা.)-এর নিন্দায় অগণিত কথা বলতে থাকে। এসব কথা তারা বলত যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকারে ইঙ্গতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে। যেমন, "প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মাতের একজনকে ওসীয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করে গেছেন। মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রদত্ত ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন আলী ইবনু আবী তালিব (রা.)। . . . যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রদানকে মেনে নিল না বরং নিজেই ক্ষমতা নিয়ে নিল, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে। . . . " - তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক ২/৬৪৭।

এভাবে শীয়ারা দাবী করে যে, আলী বংশের রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রুকন। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের তৃতীয় রুকন হলো আলী (রা.) ও তাঁর বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেয়া।

ইমামতের এ 'আকীদা' কুরআন কারীমে কোনভাবেই বিদ্যমান নেই। সাহাবীগণ কেউ তা জানেন নি। স্বয়ং আলী (রা.)ও তা কখনো দাবী করেন নি। কোন হাদীসেও তা স্পষ্টত নেই। কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে :

প্রথমত, তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ। ইবনু সাবা ও তার অনুসারী পরবর্তী শীয়াগণ কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিজেদের দাবী প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। কখনো শানে নুযুলের কাহিনী, কখনো কোন মুফাস্‌সিরের বক্তব্য, ব্যক্তিগত ঘটনা, অভিধানিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংযোজন করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, ইবনু সাবা যুক্তি পেশ করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী (আ.) স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন, কাজেই মুহাম্মাদ (সা.) স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না। পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অনেক উদ্ভট যুক্তি বানিয়ে তা তাদের আকীদার অংশ বানিয়ে নেয়।

তৃতীয়ত, কুরআন বিকৃতির দাবী। শীয়াগণ যে আকীদাকে (ইমামাত) ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে তা কুরআন কারীমে কোথাও নেই। বিষয়টি সর্বদা তাদেরকে পরাজিত করে। এজন্য তাদের অনেকেই এই উদ্ভট দাবী করে যে, মূল কুরআনে আলী (রা.) ও তাঁর বংশধরদের ইমামতের বিষয়টি ছিল। সেই বিষয়টি সরিয়ে ফেলার জন্য তিন খলীফা ও সাধারণ সাহাবীগণ মূল কুরআনের বিকৃতি ঘটিয়েছেন !

চতুর্থত, সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবী। কুরআন ও হাদীসে সাহাবীগণকে অনুসরণ করা নাজাত ও সাফল্যের মাপকাঠি বলা হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে শীয়াদের উদ্ভট আকীদাসমূহের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ জন্য শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত বলে বিশ্বাস করে।

পঞ্চমত, সাহাবীগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার। যেহেতু শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে সেহেতু তাঁদের বর্ণিত কোন হাদীস তারা সঠিক বলে স্বীকার করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাদের ইমামদের থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলোর সনদের কোন রকম সত্যমিথ্যা যথাযথ যাচাই না করে সেগুলিকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে।

ষষ্ঠত, 'তাকিয়্যা' বা আত্মরক্ষার তত্ত্ব আবিষ্কার। শীয়াগণ যাদেরকে ইমাম বলে দাবী করে তারা মুসলিম সমাজের মূল ধারার সাথে বাস করেছেন। আলী (রা.) তিন খলীফার খিলাফাত স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের সাথে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর বংশধরগণও। এগুলিকে বাতিল করার জন্য শীয়ারা 'তাকিয়্যা' বা আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব আবিষ্কার করে। তারা দাবী করে যে, আলী (রা.) ও ইমামগণ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতেন।

সপ্তমত, ব্যক্তির নির্ভুলত্ব ও বিশেষ জ্ঞান দাবীর পথ। শীয়া বিভ্রান্তির অন্যতম দিক হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে তাদের ইমামগণ ও অন্য অনেক মানুষের নির্ভুলত্ব, নিষ্পাপত্ব এবং আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের আকীদা প্রচার করা। তারা প্রচার করে যে, কুরআন-হাদীসে সবকিছু নেই। এ ছাড়া কুরআন-হাদীসে যা আছে তা

বুঝতেও আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। আর এরূপ জ্ঞান রয়েছে শীয়া ইমামগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের। কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই ওহীর জ্ঞান বলে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি। এভাবে অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয়।

অষ্টমত, জালিয়াতির পথ। শীয়াদের অতি-পরিচিত বৈশিষ্ট হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামে ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা করা এবং সেগুলির মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভট ও মনগড়া 'আকীদা'গুলি প্রমাণ করা।

১০.৫.১.২। শীয়া সম্প্রদায়ের দল-উপদল

শীয়া সম্প্রদায় অনেক দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের প্রধান তিনটি দল হচ্ছে : ১. দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়াগণ, ২. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ এবং ৩. যাইদিয়্যাহ শীয়াগণ। এই তিন দলের আকীদা নিম্নরূপ :

১০.৫.১.৩। দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়াগণ : এ দলের আকীদা হচ্ছে :

(১) ইমামতে বিশ্বাস :

শীয়াদের সবচেয়ে বড় দল হচ্ছে ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া। তাদের মতে আলী (রা.) ও তাঁর বংশের নির্দিষ্ট বারজন ইমামের ইমামতে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে ইমামত নস্‌স বা সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, এখানে ইজতিহাদ, সূরা বা পরামর্শের কোন সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ১২ ইমাম হচ্ছেন:

১- আলী (রা.), খিলাফাত ৩৫-৪০ হি.।
২- হাছান ইবনু আলী (রা.), ৩-৫০ হি.।
৩- হুসাইন ইবনু আলী (রা.) , ৪-৬১ হি.।
৪- যাইনুল আবেদীন আলী ইবনু হুসাইন, ৩৮-৯৫ হি.।
৫- মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু যাইনুল আবেদীন, ৫৭-১১৪ হি.।
৬- জাফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির, ৮৩-১৪৮ হি.।
৭- মূসা কাযিম ইবনু জাফর সাদিক, ১২৮-১৮৩ হি.।
৮- আলী রিযা ইবনু মূসা কাযিম, ১৪৮-২০৩ হি.।
৯- মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনু আলী রিযা, ১৯৫-২২০ হি.।
১০- আলী হাদী ইবনু মুহাম্মাদ জাওয়াদ, ২১২-২৫৪ হি.।
১১- হাসান আসকারী ইবনু আলী হাদী, ২৩২-২৬০ হি.।
১২- মুহাম্মাদ মাহদী ইবনু হাসান আসকারী (??)

দ্বাদশ ইমাম সম্পর্কিত মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি :
শীয়াদের বিশ্বাস ও দাবী ছিল ইমামত বংশানুক্রমে জারী থাকবে। কিন্তু ঐতিহাসিক মতে ১১তম ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইমামতের এই আকস্মিক সমাপ্তিতে দিশেহারা শীয়া নেতাদের কয়েকজন চিন্তাভাবনা করে একটি কল্পকাহিনী তৈরী করে ঘোষণা দেন যে, হাসান আসকারীর একজন ছেলে ছিল, নাম মুহাম্মাদ। তিনি শৈশবেই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান এবং তিনিই মাহদীরূপে শেষ যমানায় আত্মপ্রকাশ করবেন। দ্বাদশ পন্থী শীয়ারা এই দাবী মেনে নিয়ে গত ১২০০ বৎসর যাবৎ বিশ্বাস করে আসছেন যে, মুহাম্মাদ মাহদীই গোপনে থেকে জগৎ পরিচালনা করছেন।

(২) ইসমাতের বিশ্বাস : তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম সকলে পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিষ্পাপ ও সংরক্ষিত।
(৩) ইল্‌ম-এর বিশ্বাস : তারা বিশ্বাস করেন, ইমামগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর থেকে 'ছিনায়-ছিনায়' ইমাম পরম্পরায় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলমে লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক জ্ঞান প্রাপ্ত।
(৪) ইমামগণের মু'জিযায় বিশ্বাস : তারা বিশ্বাস করেন যে ইমামগণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত। তারা অলৌকিক কর্ম করতে পারেন ও করেন।
(৫) গাইবাহ ও রাজা'আত বা অদৃশ্য হওয়া ও প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস : তারা বিশ্বাস করেন যে তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন এবং শেষ যামানায় তিনি ইমাম মাহদীরূপে সশরীরে ফিরে আসবেন।

শীয়াগণের ইমামতের আকীদার দাবী প্রমাণে ইতোপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলিও তারা তাদের আকীদার অংশ হিসাবে বিশ্বাস করে। যেমন :
(৬) তাকিয়্যাহ (আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার অবশ্যকতায় বিশ্বাস), **(৭) কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাস** (অবিকৃত মূল কুরআন আলী (রা.) এর নিকট ছিল যা তিনি গোপন করে রাখেন, এবং যা তাঁর বংশের ইমামগণের কাছে গোপন আছে), **(৮) সাহাবীগণের বিচ্যুতিতে বিশ্বাস**, **(৯) বারাআত** বা সাহাবীগণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া এবং তাদেরকে ঘৃণা করা ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস, **(১০) সুন্নাত ও হাদীস অস্বীকার** এবং **(১১) ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ক বিশ্বাস** তথা একমাত্র আলী (রা.)-এর খিলাফাত ও পরবর্তী যুগের শীয়াগণের রাজত্ব ছাড়া খিলাফতে রাশিদা থেকে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগুতী রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বাস করা। বিশ্বে ইরাণই একমাত্র মুসলিম দেশ যার রাষ্ট্রীয় ধর্ম (দ্বাদশ পন্থী) শীয়া মতবাদ। এদেশের ৮০ শতাংশ অধিবাসীই এই শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এ ছাড়া উপমহাদেশ ও অন্যান্য দেশের শীয়াগণের অধিকাংশ শীয়া এ দলের।

১০.৫.১.৪। ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ :
শীয়াগণের ইমামতের একটি মূল নীতি ইমাম-পুত্র পিতা কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে পরবর্তী ইমাম হবেন। শীয়াদের ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিক তাঁর জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈলকে পরবর্তী ইমাম নির্ধারণ করেন। কিন্তু জাফর সাদিকের জীবিতাবস্থায় ইসমাঈল মৃত্যু বরণ করেন। এমতাবস্থায় জাফর সাদিক তদীয় কনিষ্ট পুত্র মূসা কাযিমকে তাঁর পরবর্তী ইমাম নির্ধারিত করেন।

শীয়াগণের বৃহত্তর অংশ মূসা কাযিমকে ৭ম ইমাম হিসাবে মেনে নেন। এরাই পরবর্তীতে দ্বাদশ ইমাম পন্থী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু মৃত ইসমাঈলের সমর্থকগণ ইমামতির মূল নীতি অনুসারে ঘোষণা দেন, ইসমাঈলই ছিলেন প্রকৃত ৭ম ইমাম এবং ইসমাঈলের পুত্রদের মধ্য থেকে পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত হবেন। এভাবে ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্যে প্রকৃত ইমামত আছে এই বিশ্বাসীরা যে ভিন্ন শীয়াদল তৈরী করে তারা ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়্যাহ সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত।

তৃতীয় হিজরী শতকে উবাইদুল্লাহ্ (২৫৯-৩২২ হি:) নামক এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচার করেন যে তিনিই সপ্তম ইমাম ইসমাঈলের বংশধর এবং ইমাম মাহদী। এক পর্যায়ে ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসাবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনূসের কাইরোয়ানে ফাতিমী রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করেন। এর পর তার সন্তানগণ মিসর ও অন্যান্য এলাকা দখল করেন। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ৫৬৭ হিজরীতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর হাতে ফাতিমী শীয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। এরাই মূলত ইসমাঈলীয় বাতিনী মতবাদের প্রবক্তা।

আকীদা : বাতিনীয়া শীয়াগণ অন্যান্য শীয়া ফিরকার মতই আলী বংশের ইমামত, ইমামগণের ইসমাত (নিষ্পাপত্ব), গাইবী ক্ষমতা, গাইবী ইলম ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশেষ বিশ্বাসের দুটি দিক আছে:

(১) ইমামগণ ও ইমামগণের মনোনীত বলে দাবীদারদের উলুহিয়্যাতে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মত ইবাদাত পাওয়ার যোগ্যতায় বিশ্বাস। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিশ্বাস শির্‌ক্-এ আকবার। তারা এদেরকে অবতার বা আল্লাহ্‌র দেহধারী রূপ বা আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তি ও ইবাদাত বা সর্বোচ্চ ভক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। কুরআন হাদীস ইত্যাদি তাদের কাছে মূল্যহীন, ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধিকারী বলে দাবীদারের বক্তব্যই একমাত্র দ্বীন।

(২) ইসলামের নির্দেশের গোপন বা বাতিনী অর্থের নামে ইসলামের সকল বিধি-বিধান ও হালাল-হারাম বাতিল করে দেয়া।

'বাতিনীয়া' সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা। তাদের মতে ইসলামের নির্দেশাবলীর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক অর্থ, যা সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী-বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণই জানেন। আর এই গোপন অর্থই হাকীকত বা ইসলামের মূল নির্দেশনা। শুধু সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থাৎ ইলমে বাতিন ও হাকীকত বুঝে সেমতই জীবন পরিচালনা করে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হন। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের 'ইলম লাদুন্নী' 'বাতিনী ইলম' ও হাকীকতে জ্ঞান (!) দ্বারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদাতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। অপর দিকে মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপ সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাঈলীয় বাতিনীয় শীয়াগণ 'কারামিতা' 'ফাতিমীয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামের নির্দেশের নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় নিত। এদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। এরা পঞ্চম-ষষ্ট হিজরী শতাব্দীতে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

এমনি এক অপ্রতিরোধ্য সন্ত্রাসী ছিলেন ইসমাঈলিয়া ফাতিমী শীয়ামতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসকের পুত্র নিযার-এর খলিফা ও প্রতিনিধির দাবীদার হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী। তিনি উত্তর পারস্যের আল বুর্জ পর্বতের দশ হাজার ফুট উপরে এক উপত্যকায় 'আল-মাওত' নামে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং একটি দুধর্ষ আত্মঘাতী ফেদায়ীন বাহিনী গঠন করেন এবং তার রাজনৈতিক-ধর্মীয় বাতিনী মতবাদের প্রচারণায় এদেরকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে ব্যবহার করতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাওভাবে গুপ্ত হত্যা এভাবে আর কোন দল করে নি। হাসানের পরে তার বংশধরেরা তার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে, যা তৎকালীন মুসলিম সরকারগণও দমন করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ:) হালাকু খাঁর বাহিনী এদের র্নিমূল করে।

বর্তমান যুগে আগাখানী শীয়া, ভারতীয় বুহরা শীয়া, সিরিয়ার আলাবী শীয়া এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের দ্রুজ সম্প্রদায় বাতিনী শীয়াগণের বিভিন্ন শাখা। এদের আকীদায় বিভিন্নতা থাকলেও মূল বিশ্বাস অর্থাৎ ইমামগণের উলুহিয়্যাত (উপাস্য হওয়ার যোগ্যতায়) ও ইসলামী আহকামের অকার্যকারিতায় এরা সকলেই বিশ্বাসী।

১০.৫.১.৫। যাইদিয়্যাহ শীয়াগণ :

শীয়াগণের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সবচেয়ে নিকটবর্তী ফিরকা হচ্ছে যাইদী শীয়াগণ। বর্তমানে ইয়ামানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এ মতের অনুসারী।

যাইদী শীয়াগণ নিজেদেরকে ইমাম যাইদের (৭৯-১২২ হি:) অনুসারী বলে দাবী করেন। যাইদ ছিলেন শীয়াগণের চতুর্থ ইমাম যাইনুল আবেদীনের পুত্র ও পঞ্চম ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের ভাই। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন এবং বিশ্বাসে ও কর্মে আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ তাবি'য়ীন ও তাবি-তাবি'য়ীন তাকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ১২২ হিজরীতে তিনি শহীদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়। তবে তার অনুসারীগণ তাদের বিরোধিতা চালিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ইয়ামানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যাইদী শীয়াগণের আকীদা নিম্নরূপ :

১. ইমামাত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার ফাতিমার (রা.) বংশধরদের।
২. ইমামাত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য ওহীর বা পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন নেই। বরং ফাতিমা (রা.)-এর বংশের যে কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি যোগ্যতা থাকে এবং জনগণ তাকে নির্বাচিত করে তবে তিনিই ইমাম।
৩. ফাতিমার (রা.) বংশের যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য বংশের মানুষ বা কম যোগ্য মানুষ খলীফা হলেও তা বৈধ হবে।
৪. প্রথম দুই খলীফা আবু বকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর মর্যাদায় বিশ্বাস।
৫. তৃতীয় খলীফা উসমান (রা.) এর খিলাফতে বিশ্বাস। তবে তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তির কথা তাদের অনেকে বলে থাকে।
৬. সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে ভাল বলা ও তাদের গালি না দেওয়া। বিশেষত আলী (রা.) যাদের হাতে বাইআত হয়েছেন তাদেরকে ভালবাসা।
৭. তারা তাকিয়্যাহ্‌তে বিশ্বাস করেন না।
৮. তাদের মতে ইমাম গুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকতে পারেন না।
৯. তারা ইমামগণের ইসমাতে বিশ্বাস করেন না। তবে কেউ কেউ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা.) এ চারজনের ইসমাতে বিশ্বাস করেন।
১০. ফিকহী বিষয়ে যাইদী ফিক্‌হ হানাফী ফিক্‌হের সাথে মিল রাখে।

১০.৫.২। খারিজী ফিরকা

১০.৫.২.১। উৎপত্তি ও ইতিহাস

খারিজী ফিরকার আকীদা বুঝার জন্য তাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস জানা দরকার।

৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ:) ইসলামী রাষ্ট্রের তৃতীয় খলীফা উসমান (রা.) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলী (রা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা.) আলী (রা.)-এর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবী জানান যে, আগে খলীফা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী (রা.) দাবী জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এ পর্যায়ে আলী (রা.) এর অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলী (রা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী', দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। (আরবীতে খুরুজ অর্থ বিদ্রোহ, দলত্যাগ, বের হওয়া ইত্যাদি)।

এই দলত্যাগীরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান মুসলিম। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সর্বদা তারা নিজের বুঝ বা মতকেই একমাত্র সঠিক বলে মনে করত। কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে সাহাবীগণের ব্যাখ্যার বদলে তারা নিজেদের বুঝ মত ব্যাখ্যা দিত এবং তাতে অনড় থাকত। আলী ও মু'আবিয়ার (রা.) বিরোধে তারা দাবী করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহ্র নির্দেশ হলো অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

> "মুসলিমগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালংঙ্ঘন করলে তোমরা যুলুমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।" সূরা হুজরাত ৪৯:৯।

তাদের মতে, এখানে সীমালঙ্ঘনকারী হচ্ছে মু'আবিয়া (রা.)-এর দল, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ করত আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

তাদের দ্বিতীয় দাবী হলো, কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,
"কর্তৃত্ব (বা বিধান) শুধু আল্লাহ্‌রই।" সূরা আনআম- ৫৭, ইউসুফ- ৪০ ও ৬৭। সুতরাং মানুষকে কোন বিরোধে সালিসী মজলিস দ্বারা ফায়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

তাদের তৃতীয় বক্তব্য হলো, আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন,
"আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।" সূরা মায়িদা, আয়াত- ৫:৪৪।

এ সকল যুক্তিতে তারা দাবী করে যে, আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অমান্য করার কারণে আলী, মুআবিয়া (রা.) ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কাফির হয়ে গেছেন। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝছ তা সাঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে এদের কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকীরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবী করেন। তারা সাহাবীগণকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার' সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

সালিসী ব্যবস্থা আলী (রা.) ও মু'আবিয়া (রা.) এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবী ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোষকামীতার মধ্য দিয়ে কখনো হক্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ চালিয়ে যেতে হবে। ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা তিন-চার হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয়।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক, কিন্তু তাদের চিন্তা-চেতনা ছিল বিভ্রান্ত। এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ছিল অতুলনীয়। রাত দিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসত। এ কারণে এরা 'কুররা' বা 'কুরআনপাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিল। কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। কিন্তু পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ আযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে। অথচ কোন অমুসলিম তাদের হাতে নিহত হয় নি।

এদের বিদ্রোহের পর আলী (রা.) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে এক পর্যায়ে (৩৮ হিজরীতে) আলী (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকে নিহত হয়। বাকীরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু আলী ও মুআবিয়া (রা.) মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ্‌দ্রোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে। এ জন্য আব্দুর রহমান ইবনু মুলজিম নামে এক ব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে ফজরের সালাতের পূর্বে আলী (রা.) যখন বাড়ী থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাঁকে আঘাত করে। এর ফলে আলী (রা.) শহীদ হন।

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, যুদ্ধ ও হত্যা অব্যাহত থাকে। ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে। কারণ তাদের মতে, তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলী (রা.)-কে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং তাঁদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্টার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন। তারা তাঁর সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে তাদের দাবী ছিল উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত বিধান দিয়েছেন। এ ছাড়া মু'আবিয়া (রা.) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহ্‌র বিধান পরিত্যাগ করে শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন। যেমন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর নিজের শাসন কার্য ইসলাম সম্মত বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

১০.৫.২.২। আকীদা ও মূল নীতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খারিজীদের আকীদা বুঝতে পারি। বস্তুত তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের বুঝ বা মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে মনে করত। এতে কিছু দিনের মধ্যেই তারা কয়েক ডজন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে সকল উপদল মোটামোটিভাবে নিম্নের বিষয়গুলিতে একমত ছিল।

(১) কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা কাফির এবং অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী
(২) পাপী ব্যক্তির ইমামত অবৈধ (যেহেতু সে কাফির)
(৩) পাপী ইমামের অপসারণ অত্যাবশ্যক, কেননা কাফির ব্যক্তি সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না।
(৪) যালিম বা পাপী রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং জিহাদ করা ফরয। উপরন্তু জিহাদ আরকানে ইসলামের মতই ফরয আইন এবং সবচেয়ে বড় ফরয।
(৫) উসমান, আলী (রা.) উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মু'আবিয়া, সিফ্ফীনের যুদ্ধের দুই সালিশ আমর ইবনু আস ও আবু মূসা আশআরী (রা.) এবং তাদের দুজনের বা এক জনের বিচারকে যে ব্যক্তি সঠিক বলে মনে করেন তারা সকলেই কাফির।
এছাড়া তাদের আরো অনেক মতামত রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভক্তি রয়েছে।

১০.৫.২.৩। আধুনিক যুগে খারিজীগণ

(১) ইবাযী সম্প্রদায় : খারিজী ফিরকার অধিকাংশ উপদলের বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান যুগে উপসাগরীয় দেশ ওমানে এবং উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া ও অন্যান্য দেশে ইবাযিয়্যাহ নামক খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি বিদ্যমান। এরা আব্দুল্লাহ ইবনু ইবায নামক এক ব্যক্তির অনুসারী। মূল খারিজী বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে। তবে সময়ের আবর্তনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে। মূল খারিজী আকীদার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র সিফাত, আল্লাহ্‌র কালাম ইত্যাদি বিষয়ে তারা মু'তাযিলীদের আকীদা পোষণ করে।

(২) জামাতুল মুসলিমীন (মিসর) : আধুনিক বা নব্য-খারিজীদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল হচ্ছে মিসরের শুকরী আহমদ মুস্তফা প্রতিষ্ঠিত 'জামাতুল মুসলিমীন' বা জামাতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ (প্রতিষ্ঠা- ১৯৭১)। এরা খারিজীদের মূল নীতিসমূহ সঠিক বলে স্পষ্টত স্বীকার করেছে। তারা দাবী করে যে, একমাত্র তাদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দ্বীনের বিজয় সম্ভব হবে। এক পর্যায়ে এদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির মুরতাদ হিসাবে গণ্য করে এবং এইরূপ কাফির-মুরতাদ ও যে-সকল আলিম তাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন তাদের সকলকে গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে। ১৯৭৮ সালে এদের অধিকাংশকে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হয় এবং বাকী অনেককে দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। এর পর এ দলের বাহ্যিক কার্যক্রম এর তেমন দেখা যায় না। তবে তাদের চিন্তা-চেতনা পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে।

তাদের মূল নীতিগুলির মধ্যে ছিল :
কুরআন বুঝার জন্য নিজের বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ঠ বলে দাবী করা। সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী

সকল মুসলিম প্রজন্মকে ঘৃণা করা। অতীত বর্তমান সকল আলীমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা। অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থায় সরকারকে কাফির বলা। মুসলিম দেশের যালিম মুরতাদ সরকারের আনুগত্যকারী সকল নাগরিককে কাফির বলা। পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয আইন দাবী করা। ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এই ফরয পালনে প্রয়োজনে সালাত ইত্যাদি ফরয ও বাদ যাবে।

১০.৬। অন্যান্য ফিরকা :

প্রাচীন ফিরকাগুলির মধ্য থেকে শীয়া ও খারিজী ছাড়া বাকীরা বাহ্যত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে তাদের মতামতের কিছু দিক বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে :

১০.৬.১। নাসিবা সম্প্রদায়

এদের অবস্থান শীয়াদের বিপরীত। তাদের বিদ'আতী আকীদা এই যে, আলী (রা.) সত্য-বিচ্যুত ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ককে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেন এবং তিনি ক্ষমতার লোভে হাজার হাজার মানুষের রক্তপাতের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ের সকল গৃহযুদ্ধের জন্য তিনি দায়ী। (নাউযুবিল্লাহ)।

এরা কিয়ামাত দিবসে বিদ'আতীদের অবস্থা সম্পর্কিত কিছু হাদীসকে তাদের মতের অকাট্য (!) দলীল হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন একটি হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

"আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ হাউযে আমার নিকট আগমন করবে। আমি যখন তাদের চিনতে পারব তখন তাদেরকে আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি তখন বলব: আমার সাহাবীগণ! তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, 'আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন (বিদ'আত) বা পরিবর্তন করেছে তা আপনি জানেন না।" বুখারী ৫/২৪০৬, ৬/২৫৮৭; মুসলিম ৪/১৭৯৩-১৮০০।

নাসিবী সম্প্রদায়ের মতে এই হাদীস ও একই বিষয়ে অনুরূপ হাদীসগুলি আলী (রা.) ও তাঁর অনুসারীদের বিষয়ে বলা হয়েছে। এগুলি তাঁদের সত্য-বিচ্যুতির সপক্ষে অকাট্য দলিল! অপর পক্ষে শীয়াদের দাবী এই হাদীসগুলি আলী (রা.) ও তাঁর একান্ত সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী বাদে বাকী সকল সাহাবাদের বিষয়ে বলা হয়েছে !

১০.৬..২। মুরজিয়্যাহ্

মুরজিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের আকীদাগত অবস্থান খারিজীদের বিপরীত। আমরা দেখেছি যে,

খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির ও অনন্তকাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করে। তাদের মতে ইসলামের বিধান পালন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাপ তথা সৎ আমলের ঘাটতি মানেই ঈমানের ঘাটতি তথা কুফ্‌র।

মুরজিয়্যাহ্ অর্থ বিলম্বিতকারীগণ, স্থগিতকারীগণ বা বিচ্ছিন্নকারীগণ। মুরজিয়্যাহ্‌দের বিশ্বাস, ঈমানের সাথে আমলের কোন সম্পর্ক নেই। ঈমান বা বিশ্বাস থেকে আমল বা কর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ঠ। ইসলামের কোন বিধিবিধান পালন না করেও এক ব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে। আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। যত গোনাই করুক না কেন সে জান্নাতী হবে। অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকার মত মুরজিয়্যাহরাও কুরআনের আয়াত ও হাদীস নিজেদের সপক্ষে হলে গ্রহণ করে এবং বিপক্ষে হলে তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়।

১০.৬..৩। কাদারিয়্যাহ

যারা আল্লাহ্‌র পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অস্বীকার করে তাদেরকে কাদারিয়্যাহ বলা হয়। প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগে এ মতের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রসার লাভ করে। কাদারিয়্যাগণ তাকদীর তথা আল্লাহ্‌র পূর্ব নির্ধারণ ও জ্ঞানে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ্ পূর্ব থেকে কিছু জানেন না, বরং যখন যা ঘটে তখন তিনি তা জানেন। সুতরাং মানুষের কর্মই সব, পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য বলতে কিছুই নেই। উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলাগণ (পরবর্তীতে আলোচ্য) কাদারিয়্যাহ ফিরকার মূল নীতি গ্রহণ করে।

১০.৬..৪। জাবারিয়্যাহ

'জাবার' বা জবরদস্তি করে মানুষের উপর ভাগ্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে - এই বিশ্বাসের বিশ্বাসীদেরকে জাবারিয়্যাহ বলা হয়। জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায় কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। এরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলে কিছুই নেই। মানুষ চাবি দেয়া কলের পুতুলের মতই, যা করে তা করতে সে বাধ্য। অর্থাৎ কর্ম বলে কিছু নেই, ভাগ্যই সব। আমরা দেখেছি আহলুল সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী ভাগ্য ও কর্ম এ দুটি বিষয়েই সমানভাবে বিশ্বাস করেন। জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের গুরু জাহামই জাবারিয়া আকীদার প্রথম প্রবক্তা বলে গণ্য।

১০.৬.৫। জাহমিয়্যাহ্

পারস্যের অধিবাসী জাহাম ইবনু সাফওয়ান (মৃত্যু ১২৮ হি:) প্রবর্তিত আকীদার অনুসারীদিগকে জাহমিয়্যাহ ফিরকা বলা হয়। এ ব্যক্তি ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্যকার অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয়। সে একদিকে 'জাবারিয়্যাহ' মতের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিল। সে প্রচার করত কর্মের কোনরূপ স্বাধীন ক্ষমতা মানুষের

নেই, সবই ভাগ্য। পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতেরও প্রচারক ছিল - ঈমান থাকলে কোন পাপই পাপ নয়। সে বলত, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারিফাতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফ্‌র। সে আরো প্রচার করত যে জান্নাত ও জাহান্নাম একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এছাড়া সে আল্লাহ্‌র বিশেষণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত। সে বলত, যে বিশেষণে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বিশেষিত করা যায় সে বিশেষণ আমি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে রাজী নই। কাজেই আল্লাহ্‌কে বিদ্যমান, জ্ঞানী, ইচ্ছাকারী ইত্যাদি কিছুই বলা যাবে না। তবে যে বিশেষণগুলি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন স্রষ্টা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা . . . ইত্যাদি। সে আল্লাহ্‌র কালাম (কুরআন) বা কথার অনাদিত্ব অস্বীকার করত। সে দাবী করত যে, আল্লাহ্‌র কালাম আল্লাহ্‌র (প্রয়োজন সাপেক্ষে) সৃষ্ট। কাজেই কখনো বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ বলেছেন বা কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ্ কথা সৃষ্টি করেছেন। এরূপ সকল প্রকারের বিভ্রান্তি সে একত্র করে। সে এত সুস্পষ্টভাবে যুক্তির নামে কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত যে, তেমন কোন ব্যাখ্যারও ধার ধারত না। এ জন্য ইমাম আবু হানীফা (র.) ও অন্যান্য অনেক ইমাম জাহম ও তার অনুসারীদিগকে সুস্পষ্টরূপে কাফির বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা জাহমিয়াদেরকে মুসলিম ফিরকা না বলে 'অমুসলিম' বলে গণ্য করেছেন।

পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র বিশেষণকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে সাধারণভাবে 'জাহমিয়্যা' মতবাদ বলে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে জাহমী মতবাদের অনুসারী।

১০.৬.৬। মু'তাযিলা :

মু'তাযিলা অর্থ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ বা একাকী দল। প্রথম হিজরীর শেষভাগে ও দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে মু'তাযিলা মতবাদের সৃষ্টি হয়। এদেরকে মু'তাযিলা বলা হলো কেন সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত এই যে, বিখ্যাত তাবি'য়ী হাসান বসরীর (১১০ হি.) একজন ছাত্র ছিলেন ওয়াসিল ইবনু আতা (৮০-১৩১ হি.)। তৎকালীন একটি বিশেষ বিতর্কিত বিষয় ছিল পাপী মুসলিমের অবস্থান ও পরিণতির বিষয়। খারিজীগণ তাদেরকে কাফির ও আখিরাতে অনন্ত জাহান্নামী, আর মুরাজিয়্যাহরা তাদেরকে পরিপূর্ণ মু'মিন ও অনন্ত জান্নাতী বলে বিশ্বাস করত। সাহাবীগণ ও তাঁদের অনুসারী মূলধারার তাবি'য়ীগণ এরূপ মুসলিমকে পাপী মু'মিন ও আখিরাতে শাস্তি ভোগের পর নাজাত লাভ করবেন বলে বিশ্বাস করতেন। ওয়াসিল ইবনু আতা দাবী করেন যে এরূপ ব্যক্তিকে মু'মিনও বলা যাবে না এবং কাফিরও বলা যাবে না। বরং সে ঈমান ও কুফ্‌রীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান রত। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে অনন্ত জাহান্নামী হবে, কারণ সে ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। হাসান বসরী (র.) তার এ মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে তাঁর মজলিসে আসতে নিষেধ করেন। ওয়াসিল

তৎপর হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করে বসরার মসজিদের অন্য কোণে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসতে শুরু করে। এজন্য তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে 'মু'তাযিলা' (বিচ্ছিন্ন দল) বলা হয়। সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় হিজরী শতকে এ মতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। এ মতের অনুসারীগণ গ্রীক, মিশরীয়, পারসীয় ও ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লেখা পড়ার ফলে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষদের আকৃষ্ট করেন। কয়েকজন আব্বাসী খলীফা, বিশেষত খলীফা মামুন (খিলাফত: ১৯৮-২১৮ হি.) ও খলীফা মু'তাসিম (২১৮-২২৭ হি.) তাদের যুক্তি, তর্ক, দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের মত গ্রহণ করেন এবং এ মতটিকেই রাষ্ট্রীয় ধর্মমত হিসাবে গ্রহণ করে সকল আলিমকে এ মত গ্রহণে বাধ্য করতে শুরু করেন। তবে মূল ধারার আলিমগণের, বিশেষত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের (র.) প্রবল প্রতিরোধের কারণে ক্রমান্বয়ে এ মতের অনুসারী কমতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আসলুস সুন্নাত আকীদার মূল নীতি হচ্ছে বিশ্বাসের বিষয়াদির একমাত্র উৎস হচ্ছে ওহী, এখানে মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি বা ব্যাখ্যার স্থান নেই। অপর পক্ষে মুতাযিলী আকীদার মূল বিষয় ছিল মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেককে ওহীর বিচারক হিসাবে গ্রহণ করা। তাদের আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য। ফলে মানবীয় বুদ্ধির বিচারে ওহীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে বুদ্ধিও দর্শন দিয়ে ওহীর ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় তারা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে বাতিল করে দিত।

মু'তাযিলাগণ কাদারিয়্যাহ ও যাহমিয়্যাহ ফিরকাদ্বয়ের মূল নীতিসমূহ সবই গ্রহণ করে এবং তাদের মূল নীতির ভিত্তিতে অনেক আকীদার উদ্ভাবন করেন। তারা নিজেদেরকে 'আহলুল আদলি ওয়াত তাওহীদ' অর্থাৎ ন্যায় বিচার ও একত্বের অনুসারী বলতেন। তাদের উদ্ভাবিত আকীদার মধ্যে রয়েছে :

(১) সৃষ্টির সাথে তুলনা হবে এ যুক্তিতে আল্লাহ্‌র জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবন, দর্শন ইত্যাদি অনাদি বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। এতে আল্লাহ্‌র একত্ব নষ্ট হয়। এগুলি অস্বীকার করত তারা নিজেদেরকে একত্ববাদী দাবী করত।
(২) মহান আল্লাহ্‌কে আখিরাতে দেখা যাবে না।
(৩) আল্লাহ্‌র কালাম (কুরআন) তাঁর অনাদি বিশেষণ নয়, বরং তা তাঁর সৃষ্ট বস্তু মাত্র।
(৪) তাকদীর বলে কিছু নেই। মহান আল্লাহ্ মানুষের কর্মের স্রষ্টা নন, মানুষই তাদের কর্মের স্রষ্টা। তাকদীরের অস্বীকারকেই তারা 'ন্যায় বিচারের বিশ্বাস' বলে আখ্যায়িত করে।
(৫) পাপী মুসলিম কাফিরও নয়, মু'মিনও নয়। আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী এ বিশ্বাসকে তারা 'শাস্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়ন' বলে আখ্যায়িত করত। তাদের যুক্তি, আল্লাহ্ পাপীদের শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন। এরপর যদি তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে তা ন্যায় বিচার ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পরিপন্থী হয়। আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের যুক্তিতে তারা 'শাফা'আত' বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সকল নির্দেশনা অস্বীকার করত।

(৬) অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরী ও ফরয্-এ আইন। রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। এই মতের ভিত্তিতে তারা নিজেদের এ সকল আকীদা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার জোর প্রচেষ্টা চালান।

১০.৬.৭। মুশাব্বিহা

মুশাব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ। মহান আল্লাহ্ কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর কোন তুলনা দিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহ্কে মানবাকৃতির বলে কল্পনা করেছে অথবা আল্লাহ্র সকল বা কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মত তুলনীয় বলে মনে করেছে। এই বিভ্রান্ত দলকে 'মুশাব্বিহা' বা তুলনাকারী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ডা. খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীরের শেষ কথা :

একজন মু'মিন নিজের ঈমানকে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বিশুদ্ধতম রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন, এটাই কাম্য। কারণ তাঁর সফলতা ও নাজাতের এটিই একমাত্র ভিত্তি। শির্ক্, কুফ্র, নিফাক, বিদ'আত ও বিভক্তির প্রতি হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘৃণা ও আপত্তি বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক, তবে এগুলিতে লিপ্ত ঈমানের দাবীদারদের কুফ্রী নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মু'মিন বলে গ্রহণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মাতের মধ্যকার বিভ্রান্তদের জন্য আমাদের দায়িত্ব দু'আ ও নসীহত; হিংসা ও গালি নয়। হিংসার অজুহাত না খুঁজে ভালবাসার অজুহাত খুঁজতে হবে। যার মধ্যে যতটুকু ঈমান, ইসলাম ও সুন্নাত আছে ততটুকুকেই ভালবাসার অজুহাত বানিয়ে তাকে ভালবাসতে হবে এবং তার হেদায়েতের জন্য দু'আ করা দরকার। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আকীদা ও আমলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার এবং জামা'আত বা ঐক্যের মধ্যে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

*** সমাপ্ত ***